# সুশাসনের ইতিকথা

বাংলাদেশে ১/১১ কার স্বার্থে:

সুশাসন, উন্নয়ন, সংস্কার ও স্বচ্ছ শাষন পদ্ধতি স্পর্শকাতর শব্দ ভান্ডারের সাথে আমরা সবাই অল্প বিস্তর পরিচিত। এই পদগুলোর শাব্দিক অর্থ বুঝতে অভিধানের সাহায্য নেয়া সচরাচর প্রয়োজন না হলেও শব্দগুলো ব্যবহারের যৌক্তিকতা অনেক সময় বোধগম্য হয়ে উঠে না। স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে শব্দগুলোর অর্থেরও হের-ফের হয়ে থাকে।

প্রথমেই দেখা যাক রাষ্ট্রীয় জীবনে 'উন্নয়ন' শব্দটিকে প্রয়োগ করে কি বুঝাতে চেষ্টা করা হয়। যে কোন খাত ও বিষয়ের লেজে গোবরে অবস্থাকে আড়াল করে একটি কৃত্রিম সম্ভাবনাময় অবস্থা তুলে ধরতে শব্দটির অপপ্রয়োগ হয়ে থাকে। রাষ্ট্রের জন্য মিথ্যা বলার উন্নত কলা-কৌশল যেমন কুটনীতিকদের চাকুরির নিরাপত্তা ও প্রমোশনের গুণনিয়ক হিসেবে কাজ করে ঠিক তেমনিভাবে অন্তসার শূন্য বাস্তবতাকে আড়াল করে জনগণকে মিথ্যা আশ্বাসে ভুলিয়ে রাখতে উন্নয়ন শব্দটির অপপ্রয়োগ করা হয়।

অনুন্নত বন্ধনিঘেরা অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশে ও জনগণের সাথে প্রতারণা করার নিমিত্তে উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সংস্কার ইত্যাদির অপপ্রয়োগ চিরাচরিত নিয়মে পরিণত হয়ে আছে। আমার জীবদ্দশায় দেখা পাকিস্তান ও বর্তমান বাংলাদেশের প্রায় সবক'টি সরকার এসব কাগুজে উন্নয়নের জিকির-আজকার করে পার পাবার চেষ্টা করেছেন। ১৯৬৮ ইংরেজীতে পাকিস্তানের স্বৈরশাসক আইয়ুব খাঁনের শতশত কোটি রূপি উজাড় করে ও রাষ্ট্রীয় এজেন্সি সমূহকে কাজে লাগিয়ে অগ্রগতির দশম বর্ষপুর্তি পালন করার আনন্দ-উলাসের কথা সামরিক রাজনীতির একটু-আধটু খবর যারা রাখেন তাদের সকলের মনে থাকার কথা। আইয়ুব খাঁনের দশম বর্ষপুর্তি থেকে আরম্ভ করে বাংলাদেশের বর্তমান সংকটকালীন অস্থায়ী সরকারের ছয়মাস পুর্তি আয়োজন পর্যন্ত একটি বস্তুনিষ্ঠ মিল পরিলক্ষিত হয়। আর মিলটা হচ্ছে জনগণের জীবন ধারনের সাথে সম্পর্কিত সমস্যা সমূহ দূরীকরণে সরকারের ব্যর্থতাকে আড়াল করে রাখা।

নাক, কান ও চোখ খোলা দেশবাসী এসব উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সংস্কার ইত্যাদির প্রয়োগ প্রণালীর সাথে কম বেশী পরিচিত। কেতাবী অর্থে এসব শব্দ ভান্ডারকে ব্যবহার করে নিজেদের শাসন কালকে প্রলম্বিত করা ও কৃত্রিম সফলতা দেখানো অনুন্নত বিশ্বের সরকারি সংস্কৃতির একটি অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ ১/১১ পরিবর্তনের আগের রাজনৈতিক চিত্র এত অল্প সময়ে ভুলে যায়নি। ১/১১ পর্ব পরিবর্তনের আগ মুহুর্ত পর্যন্ত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)- জামাত ইসলামীর চার দলীয় †জাটকে, সরকারের উন্নয়ন অগ্রগতির ফিরিস্তির খই ফুটা‡ত সর্বত্র দেখা যেত। উন্নয়নের জোয়ারকে জনসাধারণের চোখ ও কান পর্যন্ত পৌঁছে দিতে নেতৃবৃন্দ জ্বালাময়ী বক্তৃতা করতেন। বক্তৃতা বিবৃতি প্রদানকারী নেতৃবৃন্দের নিজেদের হয়তো বা এসব বাস্তবতা বিবর্জিত উন্নয়নের ফিরিস্তির প্রতি আস্থা ছিল না। তাই নিজেদের আস্থাহীনতাকে গোপন করে রাখতে নেতৃবৃন্দ লাল, কালো, নীল, সবুজ বা পিংকি রঙের চশমা কপালের নিচ দিকটায় এঁটে রাখতেন। হাবভাব ও কর্মকান্ডে বুঝাতেন যেন অভাব-অনটনকে তারা নির্বাসনে পাঠাতে সক্ষম হয়েছেন এবং জনরায় নিয়ে আরেকটি ধাক্কা দেবার সুযোগ পেলে শায়েস্তা খাঁর আমলের ন্যায়-ধানে, ধনে পূর্ন একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ উপহার দিবেন। এই শেষ ধাক্কাটুকু দেবার বৈধতা লাভের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হলো। বড় বড় দলগুলো নিজেদের ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়কে স্বর্ণযুগ হিসেবে আখ্যায়িত করে উন্নয়নের ফিরিস্তি দিয়ে

জনগণকে আরেকবার বোকা বানাতে মরিয়ে হয়ে মাঠে নামল। নিজেদের শক্তি, সমর্থ ও পৌরসত্তের জানান দিয়ে রাস্তাঘাটের কর্তৃত্বের দখল নিয়ে হানাহানি মারা মারি আরম্ভ হলো।

দেশের রাজনৈতিক স্রোত ধারা কার্যতঃ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। একদিকে একাত্তরের বাঙালি নিধনে পাকিস্তানি জলাদ সামরিক সরকারের অন্যতম অংশীদার জামায়াতে ইসলামী এবং পেশওয়ার ভিত্তিক ধর্মীয় উগ্রবাদে দীক্ষিত জেহাদীদের নিয়ে বিএনপি জোট। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে অপরদিকে ডান, মৃদুডান বা বাম দাবীদার দলগুলো এবং শরিয়া শাসনে বিশ্বাসী একটি ইসলামী দলের সমন্বয়ে গঠিত ১৪ দলীয় জোট। বিএনপি জোট নিজেদের পছন্দের লোকদেরদিয়ে একটি আজ্ঞাবহ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ছত্রচ্ছায়ায় এবং দলীয় সন্ত্রাসী ও পুলিশের সহযোগিতায় একটি নীল নকশার নির্বাচন করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে চিরতরে বন্দি করে রাখতে মারমুখী হয়ে উঠল। অন্যদিকে ১৪ দলীয় জোট লগি-বৈঠা নিয়ে মিছিল করার সনাতনী পদ্ধতিতে জনসমাগম ঘটিয়ে রাস্তাঘাট দখলে রাখার সংকল্প নিয়ে এগোতে থাকল। নিজেদের কর্মকান্ডের পক্ষে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভের জন্য উভয় বড়দলের চেষ্টা অব্যাহত থাকল। মার্কিন রাষ্ট্রদূত একের পর এক বাণী দিতে থাকলেন। আমেরিকার দক্ষিণ এশিয়া সংক্রান্ত সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডেভিট ভাউচার ঢাকায় এসে দুই নেত্রীর সাথে কান কথার পর বিএনপি-জামাত †জাটকে বিশেষ আর্শীবাদ দিয়ে গেলেন।

অনুন্নত বিশ্বের গরীব জনগোষ্ঠী ভাবে এক কিন্তু আমেরিকা করে আরেক। মিটিং-মিছিলের চেতনা থেকে আমেরিকা গনতন্ত্র এবং জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠার গন্ধ পেয়ে ভড়কে গেল। সময় সময় লাগাম টেনে আন্দোলনকে স্থবির করার চেষ্টা চলতে থাকল। রাজপথ দখলে রাখার শেখ হাসিনার ভুল কৌশলের সুযোগ নিল ক্ষমতাশীণ‡গাষ্ঠী। পুলিশি সহযোগিতায় একদিকে দলীয় ক্যাডার বাহিনী দিয়ে হত্যাযজ্ঞসহ সকল প্রকার নির্যাতন চলতে থাকল এবং অপরদিকে সমান্তরাল ভাবে ১৪ দলীয় জোটের মিছিলকারীরা দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও খুন খারাপিতে জড়িয়ে পড়ল। তারপরও গরীব মানুষের ভোটের অধিকার আদায়ের আন্দোলন চলতে থাকল। পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হয় খালেদা জিয়ার মনোনীত তত্ত্বধায়ক সরকার। গদি দখল ও ছাড়ার লড়াইয়ে দুই নেত্রীর বেসামাল অবস্থার সুযোগ নিতে আমেরিকা ভুল করলনা। বিশ্বস্থ মিত্রদের দিয়ে আন্দোলন ঠেকাতে দাবার চাল চালাতে থাকল।

বাংলাদেশের ন্যায় স্বল্প উন্নয়নশীল দেশে সেনাবাহিনীর রাষ্টীয় ক্ষমতায় উড়ে এসে জুড়ে বসা একটি চির পরিচিত ব্যাপার। দেশ শাসনের অভিজ্ঞতা যেসব দেশে †সনাবাহিনীর আছে, সেসব দেশে স্বচ্ছ শাসনের নামে সেনাবাহিনী নিজেদের পেশাগত স্বার্থকে জনগণের স্বার্থের চেয়েও বড় করে দেখে। এর পাশাপাশি সেনা ছাউনি পরিণত হয় ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দোতে। †বসামরিক প্রশাসনকে ও সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। দেশের মঙ্গল ও সুশাসন প্রতিষ্টার জন্য কাজ করতে †সনা কর্মকর্তারা দৃশ্যত: বিভোর থাকেন এবং দেশী-বিদেশী হিতৈষী এবং বন্ধুদের ডাকে দেশ ও জাতিকে উদ্ধার করার মহান ব্রত পালন করতে এগিয়ে আসেন।

এদিকে, আবার বিগত শতাব্দীর কৌশলে সরাসরি সেনা সরকারকে অনুমোদন না করে সেনা নিয়ন্ত্রণাধীন আংকেল সামদের সমন্বয়ে একটি লোক দেখানো বেসামরিক সরকার গঠনের মার্কিনি ব্যবস্হাপত্রকে সম্মান দেখিয়ে আমেরিকার স্হানীয় চর-বুদ্ধিজীবিরা জাতিকে উদ্ধারের স্বার্থে একটি অরাজতৈক সরকার গঠনের সিদ্ধান্তে সম্মত হলেন। নিউ লিবারিলিজমের বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় বিশ্বব্যংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের

নিয়ন্ত্রন গরিব দেশগুলোর উপর স্হায়ীকরনটা ই হচ্ছে এ চক্রটির মুখ্য বিষয় । সিআইএ'র নথিভুক্ত যারা সময় সময় আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহে চাকুরির বিনিময়ে নিজেদের দেশের স্বার্থকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে আমেরিকার জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করেছেন বা দেশের ভিতরে থেকে আমেরিকার স্বার্থ রক্ষা য় অঙ্গীকারবদ্ধ এমন কিছু লোকের সমন্বয়ে গঠিত হলো একটি তথাকথিত স সরকার । বাংলাদেশকে অসুস্থ নাগরিকদের একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করার পথে সকল প্রকার বাধা চিরতরে সরিয়ে দেয়ার অঙ্গীকার করে ট্যাঙ্ক লিবারেলরা ম্লান †সরে পবিত্র শরীর নিয়ে সরকারে যোগদান করলেন ।

১/১১-তে সেনামুখপাত্র টিভি-রেডিওতে চিরাচরিত নিয়মে ভাষণ দিয়ে জনগণের স্বার্থে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের খবর জানান দেয়ার প্রয়োজন হলো না । বিএনপি- জামায়াত জোট সরকারের মনোনীত রাষ্ট্রপতি ও জোটের নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান, মহাক্ষমতাশীল জনাব অধ্যাপক ইয়াজ উদ্দিন জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে তিনির নেতৃত্বাধীন শিখণ্ডি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ভেঙ্গে দিয়ে সেনা বাহিনী নিয়ন্ত্রিত এগার সদস্য বিশিষ্ট একটি তথাকথিত সৎলোকের অন্তরবর্তীকালীন সরকার গঠন করলেন । অবশ্য সরকারের পক্ষ থেকে গোটা দেশের জনগনকে বোকা ধরে নিয়ে বলা হলো সেনাবাহীনি সমর্থিত সরকার। বিশ্বের সকল সরকারের প্রতি যে নিজ নিজ দেশের সেনাবাহীনির সমর্থন থাকাটা উচি , সে মহা বানীটি জানার জন্য আন্তর্জতিক সম্পর্কের উপর পি এইচ ডি ডিগ্রি নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই।এই সহজ কথাটি জনগণ ভাল করে ই জানে। পুরাতন বিষয়টি নুতন করে বলার কি প্রয়োজন ছিল সেটা সেই স ই ভাল বলতে পারবে।

সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে শীঘ্রতম সময়ের মধ্যে একটি গ্রহণযোগ্য সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সরকারের আশুলক্ষ্য হিসেবে ঘোষনা করা হলো । আমেরিকার নরম এবং দয়ালু ধরনের দখল প্রতিষ্টার স্বার্থে´(Benigh hegemony) সেনাবাহিনী প্রধান প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সেনাবাহিনীর রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের অনিচ্ছার কথা ঘোষণা করলেন । মিছিল-সমাবেশসহ সকল প্রকার রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করা হল । দেশকে সংঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য এলিট শ্রেণী দ্বারা আবৃত †দশের প্রায় সব কটি মিডিয়া এই সরকারকে সমর্থন জানা তে থাকল । এদিকে মিডিয়ার সমর্থন কে শাষক গোষ্টি দৃশ্যত: জনগনের সমর্থন হিসেবে গন্য করল। জামায়াত, বিএনপি জোটের দল গুলো গা ও পা নিরাপদ দূরত্বে রেখে মৌন ভূমিকায় অবস্হান নিল। অপরদিকে বেশকিছু রাজনৈতিক দল নুতন সরকারকে সমর্থন জানাল । আবার †কান কোন দল সরাসরি সমর্থন না করে নিরবে সরকারের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করার প্রতি জোর দিল । আওয়ামী লীগ সেনা নিয়ন্ত্রিত এই সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগদান করে একাত্মতা জানাল।অপরদিকে সম য়ের দাবীর সাথে সঙ্গতি রেখে অন্তবর্তীকালীন সরকার, আধুনিক ও উদারনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় উন্নয়ন সাধন, দুর্নীতি ও সন্ত্রাস উচ্ছেদের প্রতিজ্ঞার কথা জোরে সুরে জানা ন দিল । সরকারের দুর্নীতিও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা র প্রতিশ্রুতিতে মানুষ আশার আলো দেখতে পে ল এবং অবস্হা পর্যবেক্ষণ করতে থাকল। সেনাবাহিনী প্রধান বিভিন্ন সেমিনা র, কর্মশালা ইত্যাদিতে যোগদান করে বক্তব্য দিতে আরম্ভ করলেন । অপরদিকে দুর্নীতির সাথে সংশিষ্ট সন্দেহে রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্ধকে †গ্রফতার করা হলো এবং গ্রেফতার প্রক্রিয়া চলতে থাকল ।

দুর্নীতিতে সম্পৃক্ততার পাশাপাশি চাঁদাবাজীর অভিযোগ দেখিয়ে অনেক নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হল বা মামলা ঠুকে জেলে পুতে রাখা হল । ক্ষেত্র বিশেষে আবার এসব দুর্নীতিবাজ বা চাঁদাবাজ ইত্যাদি অভিযোগকে পাশ কেটে বিগত সরকারের বাঘা দু / এক মন্ত্রীসহ কয়েকজনকে হাস্যকরভাবে ২/৩ বোতল বিদেশী মদ ঘরে রাখার অভিযোগে গ্রেফতার করে †জলে আটকে রাখা হল । গ্রপ্তার চলতে থাকল এবং

সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে আবার মাইনাস টু / থ্রি ইত্যাদি অভিনব ফরমুলাকে বাস্তবায়ন করতে আওয়ামী লীগ ও বি এন পি প্রধান যথাক্রমে শেখ হাছিনা ওয়াজেদ ও বেগম খালেদা জিয়াকে গ্রেপ্তার করা হলো। সংকট মোকাবিলার কথা বলে দেশব্যাপি রাজনীতি নিষিদ্ধ ধোষনা করে সরকারের উপদেষ্টাগণ খালি মাঠে রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দেশের দরিদ্র মানুষকে রাজনীতি বিমুখ করতে একের পর এক পদক্ষেপ নিতে থাকলেন। একটি সাধারণ নির্বাচন করার প্রধান দায়িত্বকে পার্শ্ব ও গুরুত্বহীন বিষয় ধরে নিয়ে দেশকে আমেরিকার নৈতিক উপনিবেশে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিএনপি, জামায়াতী জোট সরকারের অসমাপ্ত কাজে হাত দেয়া হল।

দেশের শতকরা ৮৫ ভাগ মানুষের জীবন ও জীবিকার সাথে সম্পর্কিত দাবীর প্রতি কর্ণপাত না করে বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ব্যবস্থাপত্রানুযায়ী সরকার একের পর এক মিল কারখানা বন্ধ করতে আরম্ভ করল। সরকারের উপদেষ্টারা দাম্ভিকভাবে নিজেদের শক্তি সামর্থের কথা জানান দিতে থাকলেন। তিলোত্তমা নগরী ও জঞ্জালমুক্ত দেশ উপহার দেয়ার নাম করে ছিন্নমূল মানুষের মাথা গোঁজার শেষ ঠাঁইটুকু বস্তি ইত্যাদি কোন রূপ বিকল্প ছাড়া বুলডোজার দিয়ে ভেঙ্গে দেয়া হতে থাকল। এর সাথে পালা দিয়ে তিলোত্তমা নগরীর নামে দেশব্যাপি হকারদের জীবিকার পথ রুদ্ধ করার ফন্দি শুরু হল। অপরদিকে, অবৈধভাবে গড়ে উঠা ধনীদের স্থাপনাগুলো ভাঙ্গার পালা আসতেই সরকারের টালবাহানা জনগনের বুঝতে দেরী হল না। সার, কীটনাশক ইত্যাদি কৃষি উপকরণকে সহজ লভ্য করার দাবীর আন্দোলনকে পুলিশ দিয়ে টেঙ্গিয়ে স্তব্ধ করে কৃষকদের বিরুদ্ধে মামলা টুকে দিয়ে সরকার সততার পরিচয় দিতে আরম্ভ করল। সরকার এসব করতে থাকল জনগণের নামে ও জনগণের জন্য।

গরীব মানুষদের উপর সরকারি জুলুমের মাত্রা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকলেও ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট নস্যাৎ করে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয় সরকার। অসাধু ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের সাথে সম্পৃক্ত দুষ্ট গোষ্ঠীকে শায়েস্তা করে বাজারে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে সরকারের সদিচ্ছা ও শক্তি দুটোর ই যে অভাব রয়েছে সে সত্যটি প্রকাশ হয়ে পড়ল। ফলে ক্রয় ক্ষমতার অভাবে সাধারণ মানুষ অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে জীবন ধারনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেল। এসব সমস্যাদি শাসকগোষ্টি নিজেদের বাড়তি সুবিধা লাভের লক্ষ্যে সৃষ্টি করেছে বা প্রাকৃতিক প্রথার উপর অত্যাধিক চাপের প্রভাবে এগুলো সৃষ্টি হয়েছে, সততার দাবীদার শিক্ষিত লোকদের সরকার এই সত্যটি আমলে নিতে চাইলনা। তাছাড়া প্রত্যেকটি দেশ হচ্ছে একেকটি রাজনৈতিক স্বত্তা এবং এর মধ্যকার প্রতিটি সমস্যায় পিছনে রাজনৈতিক মতবিরোধ জড়িত। সেই সত্যটি সরকার বিবেচনায় না নিয়ে দমন পিড়নের শাষন পদ্ধতির দিকে অগ্রসর হতে থাকল। অনির্বাচিত সরকারগুলো রাজনৈতিক মতবিরোধের পিছনের স্বার্থকে চিহ্নিত করে পূর্ববর্তিতা যাচাই করতে প্রায়শই ভুল করে। কাজেই প্রধান সমস্যাগুলো অমীমাংসিত থেকে যায় বা সময়ের অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে সেগুলো আরও ভয়াবহ রূপ নেয়।

সমস্যার সমাধানে পূববর্তিতা বা প্রায়রিটির ব্যাপারটি একটি উদাহরণ দিয়ে পরিষ্কার করা যুক্তিযুক্ত মনে করি। জমিতে পুতে রাখা মাইনের ব্যবহার ও প্রস্তুতকরণ নিষিদ্ধ করলে হাজার হাজার মানুষের হাত-পা এবং জীবন রক্ষা পায়। কিন্তু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে মাইন ফ্যাক্টরীতে কর্মরত শ্রমিকক-কর্মচারীরা চাকুরি হারিয়ে বেকার হয়ে পড়বে। এখন দেখতে হবে কোনটি প্রথমে প্রয়োজন মানুষের জীবন না চাকুরী এবং মানুষের জীবন রক্ষার জন্য কোনটি বেশি প্রয়োজন। এক্ষেত্রে অবশ্য ই মাইনের ব্যবহার ও প্রস্তুতকরন দুটি ই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা প্রয়োজন।

পৃথিবীর সব দেশের জনগণ নিজ নিজ দেশে বিদ্যমান সমস্যা সমূহ সহজেই চিহ্নিত করতে পারে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা ভৌগলিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল দেশের জনগণের নিজ নিজ †দশের সমস্যা চিহ্নিত করনে সাধারনত: ভুল করেনা কিন্তু সমস্যা সমাধানের পথ নিয়ে মত ভিন্নতা সর্বত্রই বিরাজমান থাকে। আর এই মত ভিন্নতাই হচ্ছে রাজনীতি। কোন আদর্শের পিছনে উকালতি করে ও প্রচারণা চালিয়ে অন্যের সাথে একত্রিত হয়ে সমষ্টিগতভাবে দেশের বিরাজমান সমস্যা সমাধান করার নামই হচ্ছে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা। এ জন্য রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে দেশের বিরাজমান সমস্যা সমাধানে আত্মনিয়োগ করা সব দেশের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য দেশাত্ববোধের পরিচায়ক ও একটি অবশ্য করনীয় ব্যাপার। আর জনগন এবং দেশের জন্য প্রয়োজনীয় এই পবিত্র কাজ টি অনুন্নত দেশ সমূহে উড়ে এসে জুড়ে বসা সরকারগুলো জনগন এই কাজটি করুক তা চায়না এবং জনগনের গনতান্ত্রিক চেতনাকে ভয় পায়।

এসব সৎলোকের অনির্বাচিত সরকারগুলো গাল ভরা গাম্ভিকতা নিয়ে নিজেদেরে সবজ্যান্তা যষ্টিমধু ভাবেন। তাহারা মনে করেন, তাদের জ্ঞান ও নিপুনতা জনগণের দুর্ভোগের কারন সকল সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করে একাই এসবের সমাধান করতে সক্ষম কিন্তু বাস্তবতা হলো, জনগণের সাথে সম্পৃক্ততা না থাকার কারনে জনস্বার্থে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে তাহারা সদা সর্বদা ভুল করে।

## সুশাসণ ও বাধ্যবাধকতা পালনের দায়ীত্বঃ

খুঁটির জোরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসে অনির্বাচিত সরকারগুলো সর্বত্রই প্রথাগতভাবে প্রথম দিকে কিছু মহৎ লক্ষ্য ঘোষণা করে। জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে সু শাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি দমন ও সংস্কার সাধন ইত্যাদি এসব লক্ষ্যগুলোর অন্যতম। বাংলাদেশের ১১/১ পরবর্তী সরকারের ক্ষেত্রেও এর কোন ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়নি। তাই একটু দেখে নেয়া যাক সুশাসন ও বাধ্যবাধকতা পালনের দায়িত্ব (Good governance and accountibility) বলতে আজকের দুনিয়ার কি বুঝানো হয়।

দুনিয়ার সবকটি দেশের সরকার এবং আমাদের রহস্যজনক বর্তমান পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহ সর্বত্র মানুষের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে এমন কিছু নিয়মনীতি ও আইন তৈরি ক রে থাকে। অশিক্ষা বা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভুল ব্যাখ্যা প্রাপ্তির কারনে উন্নয়নশীল বিশ্বের অনেক নাগরিক-ই জানেন না যে, তাদের নামে কি করা হয়েছে বা হচ্ছে। তাই জনগণের নামে কি হয়েছে বা কি হতে যাচ্ছে বা এসব নিয়ে কিভাবে কথা বলা যায় ইত্যাদির উপর জ্ঞান থাকা বিশ্বের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য অত্যাবশক।

আর এই অত্যাবশক কাজটি সম্পাদন করে জনগণকে ওয়াকিবহাল রাখা সুশাসনের পূর্বশর্ত। আর এই অত্যাবশক কাজটি গণতান্ত্রিক দুনিয়ার সর্বত্র রাজনৈতিক দলগুলো করে থাকে। রাজনীতির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করে সুশাসনের পূর্বশর্ত জনগণকে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণের সুযোগ দানের চিন্তা করা জনগণের সাথে পরিহাসের নামান্তর। এ পরিসরে একটি বিষয় পরিস্কার করা দরকার আর তা হচ্ছে, শুশীল সমাজ নামক বস্তুটি সর্বস্তরের জনগনের প্রতিনিধিত্ব করেনা এবং কেবলমাত্র রাজনৈতিক দল ই এ দায়ীত্বটি পালন করার যোগ্যতা রাখে।

---

শাসন পদ্ধতি অবশ্যই একটি জরুরি বিষয়। পৃথিবীর ইতিহাসের উপর চোখ দিলে দেখা যায় কোন কোন সরকার ব্যবস্থা অন্য সরকার ব্যবস্থার চেয়ে উন্নত ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে জনগণকে নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে সামর্থশীল করে তুলে। সাধারণ তঃ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত দেশগুলো দারিদ্রের অভিশাপে আচ্ছন্ন থাকে এবং এ সব দেশে জনগণের স্বাধীনভাবে জীবন ধারনের সামর্থ সেই অর্থে থাকে না। এ সব দেশের

জনগণ রাষ্ট্রের দায়িত্বের উপর বর্তায় এমন সব মৌলিক সেবা থেকেও বঞ্চিত থাকে। তাই দারিদ্র ও দুর্নীতি উচ্ছেদকরণ সুশাসনের জন্য অপরিহার্য। আরেকটি বিষয় যা সুশাসনের জন্য অতীব জরুরী, সেটা হলো রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহনে জনগনের অংশগ্রহন। যদিও সবকটি খুটির জোরে বসে থাকা সরকার সিদ্ধান্ত সমূহ গোপনে নিয়ে থাকে এমনকি অনেক তথাকথিত গনতান্ত্রিক সরকার ও (নিয়ন্ত্রিত গনতান্ত্রি ক) রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত সমূহ গোপনে নিতে অভ্যস্ত ও স্বাচ্ছন্দ অনুভব ক রে। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য যে, রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের অংশগ্রহণ দেশবাসীর †দশাত্ববোধের চেতনা বৃদ্ধি করে এবং একটি স্বচ্ছ শাসণ ব্যবস্হা প্রতিষ্টার জন্য এর কোন বিকল্প নেই। সুশাসনকে গতিশীল করে এমন সব প রিপ্রেক্ষিত ও প্রয়োজনীয় উপাদানের উপর এবার একটু আলোকপাত করা যাক।

সুশাসনের জন্য অপরিহার্য প্রধান উপাদানগুলো হলো নিম্নরূপঃ

১. জনগণের নিরাপত্তা (Security)
২. আইনের শাসন ( Rule of law)
৩. মূল্যবোধের অংশীদারিত্ব (Shared values)
৪. আলোকিত নেতৃত্ব (Enlightened leadership)
৫. জনগণের প্রতি দায়িত্বশীলতা (Responsiveness to the People)
৬. জবাবদিহিতা (Accountability)
৭. স্বচ্ছতা (Tranparencey)
৮. অভ্রান্ত ও দুর্নীতিমুক্ত অর্থ সংক্রান্ত ব্যবস্থা (Sound financial Managment and the absence of corruption)
৯. কার্যাপোযোগী প্রতিষ্ঠান (Effective institution)
১০. স্থানীয় উদ্যোগের প্রতি একটি সহানুভূতিশীল পরিবেশ। (A favourable climate for local enterprize)
১১. জনসমর্থন ( Public support)
১২. জনগণকে প্রভাবিত করে এমন সব সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের অংশগ্রহণ করা। ( Participation of people in decision making process that affect People)

উপরোলিখিত উপদান সমূহ সুশাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হিসেবে বহুল স্বীকৃত। এগুলোর ব্যবহার আজ আর কোন দেশের সীমা রেখার মধ্যে সীমিত নয়। আন্তর্জাতিক সংস্থা সম হে পর্যন্ত এসবের ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য জোর প্রচার চালানো হচ্ছে এবং কোথাও কোথাও কার্যকর করা হচ্ছে। ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত 'UN Millennium Declaration' সমাবেশে চীন, ভারত, ইউরোপিও দেশগুলো এবং আমেরিকাসহ পৃথিবীর ১৪৭ দেশের নেতৃবৃন্দ সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য উপরোলিখিত উপাদান সমূহকে জাতিসংঘ সহ আন্তর্জাতিক পরিসরে ব্যবহারের ঘোষণা দিয়েছেন (সূত্রঃ UN Millennium Declaration, Sept 2000, www.un.org/millennium/index.html : quoted in, In the name of the people:Strengthening Global Accountability, Titus, Alexander, Chair of the Charter 99)

রাজনৈতিক দর্শন ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উপরোলিখিত প্রতিটি উপাদানের উপর জোর দেয়ার মাত্রায় অ বস্হান ও প্রতিটি দেশের স্হানীয় পরিস্হির কারনে এই মাত্রায় কিছ্ুটা কমবেশী হতে পারে। কিন্তু

জবাবদিহিতার নীতি অর্থাৎ সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া জনগণের কাছে দায়ী থাকতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর জনগণের কথা বলার ও মতামত প্রদানের স্বাধীনতা থাকতে হবে। সামরিক সরকার, সেনা নিয়ন্ত্রিত সরকার, কোন বিদেশী শক্তির অনুমোদনে ক্ষমতাসীন সরকার বা অন্যকোনভাবে খুঁটির জোরে ক্ষমতা দখলকারী সরকার দৃশ্যতঃ সর্বত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি উচ্ছেদের ব্রত নিয়ে ক্ষমতায় আসে। তবে, মজার ব্যাপার হচ্ছে ঐসব উড়ে এসে জুড়ে বসা সরকারগুলো সুশাসন প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে, এশিয়া-আফ্রিকা ও লাতিন আমেকিার অনুন্নত দেশগুলোকে ব্যর্থ রাষ্ট্রের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। তর্কের জন্য বলা যেতে পারে যে, সুশাসনের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে ক্ষমতা দখলকারী সরকারগুলো আলাদীনের প্রদীপ দিয়ে দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত জঞ্জাল রাতারাতি পরিষ্কার করে ফেলতে পারে না। বাস্তবে এমনটি আশা করা অবৈজ্ঞানিকও বটে। তবে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পক্ষে কাজ করতে হলে অবশ্যই জনগণকে প্রভাবিত করে এমন সব সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। আর জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতির উন্নয়ন গোটা দেশ ও জাতিকে অরাজনৈতিককরণের প্রক্রিয়ায় রেখে হতে পারে এমন কোন উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। আজকের এই জটিল পৃথিবীর ভাল বা মন্দ প্রায় ঘটনা ও বিষয়াদি সাধারন মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এজন্য শুধু ঘটনা বা বিষয়কে দায়ী করলে চলবে না। বরং জনগন নিজেরাই এসব সংশোধন করে গনতন্ত্র প্রতিষ্টার দায়িত্ব নিতে হবে। আজকের নিউলিরাবেলিজেমের আদর্শে পরিচালিত বিশ্বায়নের যাতাকলে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ ও বিষয়াদি পৃথিবীর সব ক'টি মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে। তবে একথাটি ও সত্য যে, যে কোন ঘটনার ফলাফল মানুষের প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ মানুষ কিভাবে গ্রহণ করল তার উপর ঘটনায় ফলাফল নির্ভর করে। অলস হয়ে ঘরে বসে শুধু ঘটনাকে দোষারোপ করার প্রবণতা নিজেকে ক্ষমতাহীন বলির পাঠায় রূপান্তরিত করে। কোন ঘটনায় দায়িত্ব নেয়ার অর্থ হচ্ছে নিজেকে ক্ষমতাসীন করা ও নিজের জীবনের গ্রন্থকার হওয়া। কিভাবে আমরা প্রতিক্রিয়া জানাই সেটা নিজেদের ক্ষমতা, পারদর্শিতা, ইচ্ছাশক্তি, বোধগম্যতা এবং দুরদর্শিতার উপর নির্ভর করে। আর এইসব গুণাবলী নিজের আয়ত্বে এনে এসবের উন্নয়ন করা সম্ভব।

পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ উপরোলিখিত গুণাবলীকে নিজে দের আয়ত্বে এনে ঘটনার সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করে, নিজেদের ক্ষমতাবৃদ্ধির নিমিত্তে দলবদ্ধ হয়ে নিজেদের কে দমন পীড়ন থেকে মুক্ত করতে সম্ভব হয়েছে। এই কাজটি কেবলমাত্র রাজনীতি সচেতন হয়ে একে অন্যের সাথে দক্ষতা, জ্ঞান, যোগাযোগ ও ক্ষমতা একত্রিত করার মধ্যদিয়ে ই সম্ভব। উন্নয়নশীল বিশ্বের জনগণের এই রাজনীতি সচেতনতাকে বাণিজ্যিক বিশ্বায়নের পশ্চিমা মোড়লরা ভয় পায়। উন্নয়নশীল বিশ্বকে অরাজনৈতিক করে আমেরিকা ও তার সহযোগিরা নিউলিবারেল বিশ্বায়নের মাধ্যমে দারিদ্র বৃদ্ধির প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে চায়। এই অরাজনৈতিকরণের কাজটি আমেরিকা তার পছন্দসই সরকারগুলোকে অনুমোদন দিয়ে উন্নয়শীল বিশ্বের রাজনীতি ও রাজনৈতিকদের কারনে অকারনে বিষাদাগার করে রাজনীতিকে পঁচা ও দুর্গন্ধময় বিষয় হিসেবে তুলে ধরে জনগণকে রাজনীতি বিমুখ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। পৃথিবীর তাবৎ মানুষ উন্নয নের নিমিত্বে নিজ নিজ সাধ্যমত চেষ্টা করে চলছে। ব্যক্তি বা রাষ্ট্র সব উন্নয়নের পেছনে থাকা চাই নির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা ও সময়োপাযোগী উদ্যোগ। কিছু না কিছু পরিবর্তন আমাদের ভূ-মন্ডলে সদাসর্বদা হয়েই চলছে। এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে বেগবান করে উন্নয়নকে ব্যাপক মানুষের স্বার্থে গঠনমূলক পথে তরান্বিত করতে একটি বৈজ্ঞানিক রূপরেখার প্রয়োজন। যেকোন দেশের উন্নয়নের রূপ রেখা জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে মাথায় রেখেই গ্রহণ করতে হয়। উদাহরণসরূপ বলা যায়, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে উন্নয়নের রূপরেখা কি হবে? কে বা কাহারা উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে নিয়ামক

শক্তি। পুঁজির উৎস নির্ধারণ এবং সর্বোপরি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর জনগণের অধিকার নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি প্রশ্নগুলো বিবেচনায় রেখেই উন্নয়নের রূপরেখা বা রোডম্যাপ প্রণয়ন করতে হবে।

বাংলাদেশের ন্যায় কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতির দেশে প্রথমেই কৃষক ও শ্রমিক থেকে আরম্ভ করে সর্বস্তরের জনগণকে সমকালীন উন্নয়ন প্রক্রিয়া ও লক্ষ্য সমন্ধে জ্ঞাত করে গোটা জনগণকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করতে হবে। এটা শুধু গুটিকয়েক অর্থনীতিবিদ, আজ্ঞাবহ রাজনীতিক বা কোন সেনা কর্মকর্তার শুভ ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। এ কাজে ধারাপাত মুখস্থ করে শুধু শুভংকরের ফাঁকি-ফন্দি যথেষ্ট নয়। এজন্য সর্বপ্রথম আজকের নিউলিবারেলিজেমের বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের ন্যায় একটি অনুন্নত দেশের উন্নয়ন সম্ভাবনাকে বাস্তবতার আলোকে দেশবাসীর কাছে তুলে ধ রা প্রয়োজন। তাই উন্নয়ন শব্দটি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কি বুঝায় ও উন্নয়নশীল দেশ সমূহের আজকের দিনের উন্নয়নের বাস্তবতার উপর অ ল্প বিস্ত র জ্ঞান থাকা প্রয়োজন আর এজন্য এ লেখা।

উন্নয়নের রাজনীতি:

প্রথমেই দেখা যাক রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে কিভাবে ও কখন থেকে 'উন্নয়ন' শব্দটি একটি বিশেষ ধারনা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। উন্নয়ন শব্দটির বহুবিধ ব্যবহার সর্বত্র এবং সর্বকালে থাকলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংস্তুপ থেকে বের করে পুনর্নির্মানের প্রক্রিয়ায় দুনিয়ার সবক'টি মানুষকে গণতান্ত্রিক আইনধারা শাসিত ও কল্যাণকামী রাষ্ট্র ব্যব স্হ ার পরিসীমায় বসবাসের সুযোগ করে দিতে এবং সর্বোপরি একটি নতুন মানবিক বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার ধারনা হিসেবে শব্দটি র ব্যব হার আরম্ভ হয়।

আর যুদ্ধ নয় এবং একটি মানবিক পৃথিবী প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করলেও মহাশক্তিধর দেশগুলো পরবর্তিতে তাদের কথা রাখেনি। যুদ্ধ মারামারি, হানাহানি, গোটা পৃথিবীর উপর কতৃত্ত প্রতিষ্টা, অন্য রাষ্ট জবর দখল ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের প্রতারণা একটি নিত্যনৈমিত্ত বিষয়ে পরিণত করে রাখা হয়েছে। সাত / আট শত বৎসর আগের সেই ভ্রমনের মাধ্যমে আবিষ্কারের প্রয়াস থেকে আরম্ভ করে সাম্প্রতিক কালের ইরাক দখল পর্যন্ত সবক'টি লীলা খেলাকে ন্যায় ও কল্যাণমূলক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে আমেরিকা ও ইউরো পের শক্তিধর মোড়লদের অপপ্রচার অব্যাহত রয়েছে। এসব শক্তিধর দেশগুলো এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সাহায্য করার মহান ব্রতকে বাস্তবায়ন করতেই ঐসব লীলা খেলা চালাতে হচ্ছে, এমন একটি মিথ্যা ধারনা কে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট রয়েছে। গরিব দেশের জনগনের দ্বারা উ

দাম নির্ধারণ,বাজার নিয়ন্ত্র ণ, বেচাকেনা, অন্যদেশে অনাধিকার প্রবেশ, দখল, উপনিবেশ প্রতিষ্ঠাসহ সবধরনের অপকর্ম অসভ্য জনগোষ্ঠীকে সভ্য করতে বা বর্তমানকালে নিপীড়িতদের গণতান্ত্রায়ন করে উদ্ধার করার মহান প্রয়াস দেখিয়ে পশ্চিমা মোড়লরা ভ্রাতার ভূমিকায় অভিনয় করে দুনিয়ার সকল গরীব মানুষকে শোষণ করার প্রক্রিয়া অভ্যাহত রেখেছে।

পশ্চিমা বিশ্বের জ্ঞান ভান্ডার থেকে প্রসবিত আন্তর্জাতিক পর্যায়ের 'উন্নয়ন' ধারনাটি ও একই কর্মধারায় পরিচালিত হয়ে আসছে। যেকোন দেশের স্থানীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক চিহ্নিত চাহিদা বা তাদের ইচ্ছা-আকাংখার অবস্থান বিবেচনা না করে কেবলমাত্র উন্নত বিশ্বের কর্তাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে কোন উন্নয়ন প্রক্রিয়া কোথাও সফল হতে পারেনি। বিষয়টি এমন নয় যে, উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় না এনে শুধুমাত্র বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের কর্তারা যেভাবে যেখানে প্রলোপ-মলম দিতে বলবেন সেখানে ল া গা‡লই অনুন্নতের ঘা শুকিয়ে যাবে।

উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতগুলো কি চলুন দেখে নেই। প্রথমেই যে ধারাটি আসে তা হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নতি। অর্থনৈতিক উন্নতি আবার আধুনিকায়নের সমার্থক। অন্যদিকে, ছোট বা বড় যেকোন দেশের শিল্পায়ন ব্যতীত আধুনিকায়ন প্রায় অসম্ভব। শিল্পায়ন ও আধুনিকায়ন অর্থনেতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য অপরিহার্য। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পক্ষান্তরে জনগণের জীবনযাত্রার মান ও ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং জনগনের মধ্যে একটি জয় জয়কার ভাবের জন্ম দেয়। আর এরকম একটি জয় জয় অবস্থা যে কোন দেশে গণতন্ত্রকে লালন ও প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

আধুনিকায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে অবশ্য মত-ভিন্নতা রয়েছে। কেননা প্রতিটি দেশ একটি ভিন্ন আর্থসামাজিক অবস্থান থেকে আধুনিকায়নের পথে যাত্রা শুরু করে। বিভিন্ন দেশের আধুনিকায়নের ইতিহাস পর্যালোচনা করে এমন দু'টি দেশ পাওয়া যাবে না যেগুলো একই অবস্থান থেকে আধুনিকায়নের পথে যাত্রা করেছে। প্রতিটি সমাজের একটি ভিন্ন সামাজিক চরিত্র রয়েছে। দুই বা ততাধিক দেশ একই সামাজিক স্তর থেকে আধুনিকায়নের পথে যাত্রা করতে পারে এমন অযৌক্তিক প্রস্তাবটি তর্কের জন্য মেনে নিলেও সম মাময়িক কালের উন্নত দেশের ব্রেকেট বা বন্ধনী র মধ্যে এ ধারনাটি স্থান করে নিতে পারেনি।

বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল কর্তৃপক্ষ যেকোন দেশের সামাজিক স্তর ও প্রক্রিয়াগত ত্রুটি-বিচ্যুতিকে বিবেচনায় না নিয়ে নাক, কান ও চোখ বন্ধ রেখে সবক'টি উন্নয়নশীল দেশকে একই ধরনের ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকে। আধুনি কায়নের পথে যাত্রার নিমিত্তে বাধ্যবাধকতা আরোপ করে উন্নয়নশীল দেশ সমূহের সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়েছে বা ধ্বংস করার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। উপরোলিখিত উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিত ত্রুটিপূর্ণ হওয়াতে এবং এই প্রক্রিয়ার লক্ষ্যে পৌঁছানো র বাস্তবতা সম্ভব নয় মনে করে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা সমূহ দ্বিতীয় একটি উন্নয়ন প্রক্রিয়া গ্রহণ করে। এই দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার উন্নয়নের সম্ভাবনাকে বিশেষণ করতে গিয়ে The United Nations Development Programme (UNDP) বলে :-

`Development is to lead long and healthy lives, to be knowledgeable, to have aceess to the resources needed for a decent standard of living and to be able to participate in the life of the community' (সুত্রঃwww.undp.org) এই পরিসরে জাতিসংঘে মানবসম্পদের উন্নয়নকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থনীতি ও লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাসের উপর বিস্তৃত গবেষণা চালায় UNDP। এই গবেষণাকে ভিত্তি করে বাৎসরিক মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রতিবেদনে বিশ্ব উন্নয়নের বর্ণনা দেয়া হয়। এই সূত্রের আলোকে ২০০০ সালে জাতিসংঘভূক্ত রাষ্ট্র সমূহ উন্নয়নের ৮টি লক্ষ্য চিহ্নিত করে। যাহা Millennium Development Goals (MDGS) নামে পরিচিত।

এই আটটি লক্ষ্য হল, চরম ক্ষুধা নিবারণ ও দারিদ্রমোচন, বিশ্বজনীনভাবে সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করণ, লিঙ্গ সমতা ও মহিলাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি। শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করা, মাতৃ স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান, এইচ আই ভি/এইডস, ম্যালেরিয়াসহ অন্যান্য ভয়াবহ রোগের মূলোৎপাটন করা, পরিবেশকে নির্মল রাখা এবং একটি বিশ্ব উন্নয়ন পার্টনারশীপের ধারনা বিকশিত করে তোলা। (সূত্র : www.keepourword.org / www.undp.org)।

এরপর ২০০৫ সালে আয়ারল্যান্ডের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার (Trocaire) প্রতিবেদনে MDGS প্রস্তাবিত লক্ষ্য সমূহে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি বলে মত প্রকাশ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে Trocaire চারদফা সুপারিশ পেশ করে। এই দফাগুলো হল

(1) Stronger emphasis on human rights, national priorities, and local participation in MDG's, (2) Reform of Global Governance-The united Nations, International Monetary Fund-IMF, World Bank-WB, as well as the World Trade Organization-WTO, making them more democratic and more responsive to local political realities, in particular the needs of the poor, (3) Global trade to take account of people's rights to food,shelter,work, and health. (4) Aid from Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Countries to be increased to 0.7 Percent of Gross National Product (GNP) and the aid system reformed, including 100 Percent debt cancellation for poor's countries, making it less dependent on rich countries (সূত্র : www.trocaive.org/policyandadvocancy/mdgs/

অর্থাৎ

১) মানবাধিকার ও প্রতিটি দেশের জাতীয় অগ্রবর্তিতার ভিত্তিতে সামাজিক অবস্থানের উপর জোর দেয়া এবং MDG's স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, ২) বিশ্বায়ন ব্যবস্থার কার্যকরী সংস্কার সাধন, তথা জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, বিশ্বব্যাংক ও ওয়ার্ল্ড ট্রেইড অর্গানাইজেশনের সংস্কার করা। অর্থাৎ এসব নিয়ামক সংস্থা সমূহকে কার্যকরীভাবে গণতান্ত্রিক রূপ দেয়া এবং এসব সংস্থা সমূহ‡ক গরীবদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা য় নিতে বাধ্য করা, ৩) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে মানুষের খাদ্য, বাসস্থান, কাজ ও স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করনে এবং এই সবের মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল রেখে পরিচালিত করা, ৪) OECD ভুক্ত †দশগুলোর উন্নয়ন বাজেট জাতীয় আয়ের ০.৭% হারে বৃদ্ধি করা, ঋনের জালে আটকে পড়া গরীব দেশ সমূহের ঋণ শতকরা একশত ভাগ মওকুফ করা এবং ধনী দেশগুলোর উপর নির্ভরশীল হ্রাস করা।

এদিকে, মানবসম্পদ উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিত মানুষকে তাদের সামনে দন্ডায়মান পর্বতসম বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে এবং নিজেদের সামর্থকে যুক্ত করে নিজ নিজ জীবন ও জাতির জন্য কাজ করতে বলে। মানব সম্পদ উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিত, উন্নয়ন বলতে শুধু পশ্চিমা সাহায্য, ঋন বা এইড বুঝায় না। এই প্রক্রিয়া প্রকৃত পক্ষে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষায় গরীব মানুষের ক্ষমতাকে শক্তিশালী করা র স্বার্থে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে কাজে লাগাতে আন্তরিক ভাবে কাজ করে। এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নিউলিবারেজিমের বিশ্বায়ন ধারাকে পরাস্ত করে বিশ্বের সকল গরীব মানুষের স্বার্থে সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত এক গণতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলতে তাগিদ দেয়। বিশ্বব্যাপি আমেরিকার একক কতৃত্বকে পরাজিত করতে এবং বিশ্বব্যাংক ও আই এম এফ এর ধংসাত্মক ব্যবস্হাপনার বাহিরে একটি বিকল্প গনতানিত্রক বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে একত্রিত হয়ে কাজ করা আজ খুবই জরুরী। এটা আজ দিবালোকের মত সত্য যে, এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকা র উন্নয়নশীল দেশের গরীব মানুষের উন্নয়ন ব্যাহত হওয়ার পিছনে ক্ষমতাধর দেশগুলোর হাত কাজ করে।এসব দেশ উন্নয়নশীল দেশ সমূহের সম্পদ হরন করে নিজেদের মুনাফা বৃদ্ধির জন্য মরিয়া হয়ে কাজ কর ছে। ঐসব পিশাচদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল গরীব জনগোষ্ঠীর রক্ত চুষে নিয়ে তাদের পকেট ভারী করা এবং নিজেদের দেশকে উন্নত দেখিয়ে বড়াই করা।

## আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্হাঃ

নিউলিবারেলিজম বা `Washington Consensus' কি এ সমন্ধে একটু বর্ণনা দেয়া প্রয়োজন। এটি একটি নব্য ও লুটেরা ব্যবসায়ীতন্ত্র সৃষ্টির স্বার্থে এবং লাগামহীন মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে ধনীদের জন্য এক চেটিয়া মুনাফা অর্জনের নিমিত্তে একটি ব্যতিক্রমধ র্মী স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করে। যাহা বিশ্বব্যাপি টাকা ও উন্নয়নশীল বিশ্বে পশ্চি মের এবং ধণীদেশগুলোর দ্রব্যাদির অবাধ বিচরণ নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। এই লুটেরা তন্ত্র বিশ্বের সবক'টি উন্নয়নশীল দেশকে নিজেদের সীমা রেখা খোলে দেয়ার জন্য এবং সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতা প্রত্যাহার করে নেয়ার চাপ জন্য চাপ †দয়। বাজার ব্যবস্থাকে লুটেরা বিদেশীদের কাছে উন্মুক্ত করে দিতে বিশ্বব্যংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রাতহবিলের মাধ্যমে চাপ প্রয়োগ করে উন্নয়নশীল দেশের সরকারগুলোকে বাধ্য করে। অর্থাৎ বিশ্বের সর্বত্র রাষ্ট্র ও সমাজ থেকে নৈতিকতাকে সমাহিত করে পশ্চিমাদের স্বার্থে অবাধ, উন্মুক্ত, একপেশে ও একচেটিয়া বাজার বৃদ্ধি করাই হচ্ছে এই তন্ত্রের মুল কথা। বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল তাদের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার দোসরদের প্রত্যেক্ষ প্ররোচনায় মানবতা বিরোধী এই তন্ত্রকে চলমান বিশ্বায়নে মুক্তবাজার পুঁজিবাদ নামে প্রয়োগ করে সারাবিশ্বের দারিদ্র জনগোষ্ঠীকে বলির পাঠায় রূপান্তরিত করে চলছে। আর বিশ্ব রাজনীতির সম্প্রতিকালের একটি প্যারডিম, নিউ কনজারভেটিভ, (Nea-conservative)-Project for a New American Century এবং এর হোতাদের মধ্যে প্রেসিডেন্ট G.W. Bush, Vice President Dick Chaney, Henry Kissinger, Podhoretz ও wolfoitz প্রমুখ ব্যক্তিরা অ ন্যতম এবং তাহারা বিশ্ব ক্ষমতাকে একক শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন তথা আমেরিকার নিয়ন্ত্রনে রাখতে কাজ করে যাচেছন। বিশ্বব্যাপি আমেরিকার একক ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার অভিপ্রায়ে নিউলিবারে লিজমের বিশ্বায়নকে কার্যকরী করতে তাহারা সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা কর‡ছ। এই নিউলিবারেল বিশ্বায়ন একটি জটিল রাজনৈতিক চাল। উন্নয়নশীল বিশ্বের জনগণকে অরাজনৈতিককরণের মাধ্যমে তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ধ্বংস করা এবং দরিদ্র জনগণকে শৃংখলাবদ্ধ ক রে রাখা ই হচেছ আমেরিকা ও তাদের বিশ্বায়নের মূখ্য উদ্দেশ্য।

এই নিউলিবারেনিজম আদর্শের উদ্ভাবক হলেন অস্ট্রিয়ান ও আমেরিকা বংশদ্ভোত যথাক্রমে ফ্রেডরিক হায়েক (Friedrich Hayek) ও মিলটন ফ্রাইডম্যান (Milton Friedman)। অন্য দেশের এবং বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়ন সাধনের নামে আ ভ্যন্তরিন বিষয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে বা সামরিক বাহিনীকে উস্কানি দিয়ে রাষ্টীয় ক্ষমতা দখল করা নো এবং প্রয়োজনে স্বাধীন চেতা নেতৃত্বকে উ

ক রে একটি পুতুল সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়ে নিজেদের মুনাফা বৃদ্ধি এবং আমেরিকার কতৃত্ত প্রতিষ্টা করা ই হলো এর মূলমন্ত্র। কোথাও কোথাও আমেরিকা আবার নিজেদের আজ্ঞাবহ লোকদের মাধ্যমে জনরোষ সৃষ্টি করে আজ্ঞাবহ লোকদের ক্ষমতায় বসিয়ে দিয়ে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করে। মনে রাখা খুবই প্রয়োজনীয় যে, গত শতাব্দীর প্রথম দিকে আমেরিকা বিশ্ব রাজনীতিতে একটি শক্তিশালী দেশ হিসেবে আবির্ভুত হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি অন্যদেশে ২২০ বারের উপরে হস্তক্ষেপ করেছে। আর এদিকে, আজকের দুনিয়ার ৮টি যুদ্ধবাজ দেশের সমিতি জি-৮, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে( IFIS) নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

আলাহ-ভগবান বা গডের পর একমাত্র নিউলিবারেলিজিমের বিশ্বায়ন নীতিমালা ঋনের জালে আটকে পড়া অনুন্নত দেশ সমূহকে উদ্ধার করতে এবং উন্নয়নশীল বিশ্বকে ধনী দেশের সমিতিতে নিয়ে আসতে পারে এমন একটি প্রচার সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থেচার (১৯৭৯) এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগান (১৯৮১-৮৯) প্রথমে যুগপতভাবে এই দানবীয় আদর্শটি কার্যে প্রয়োগ করেন। মূলত তাহারা এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিদ্যুৎসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ খাতকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করতে বলিষ্ট ভূমিকা রাখেন। এই ভাবেই নিউলিবারেলিজিম তথ্যটি রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে অকার্যকর করে ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির আলোকে মুনাফা বৃদ্ধির স্বার্থে গোটা পৃথিবীকে একটি ব্যবসায়ী সমিতিতে পরিণত করেছে।

এই ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়াটি বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও ওয়ার্ল্ড ট্রেইড অর্গানাইজেশন প্রভৃতি সংস্থা সমূহ তাদের পিছনের রাজনৈতিক শক্তি আমেরিকা র সহযোগিতায় উন্নয়নশীল দেশের সরকারগুলোকে বাস্তবায়ন করতে প্রচন্ড চাপের মধ্যে রাখে। ঐসব আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহ আমেরিকা ও তার পশ্চিমা মিত্রদের মুনাফা বৃদ্ধির নিমিত্তে উন্নয়নশীল বিশ্বকে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ'র ব্যবস্থাপত্র বাস্তবায়ন করতে বাধ্য করে। নিউলিবারেলিজমের ব্যবস্থাপত্র বাস্তবায়নে উন্নয়নশীল বিশ্বের কোন সরকারের অনীহার ব্যাপারটি ধরা পড়লে ঐসব সরকার বা দেশের বিরুদ্ধে ভ্রান্ত প্রচার কার্যে আমেরিকা ও তার পদাঙ্ক অনুসরণকারীরা তাদের প্রচন্ড ক্ষমতাশীল প্রচার মাধ্যমকে সদা জীবন্ত রেখেছে। এই প্রচার কার্য কেবলমাত্র পশ্চি মের দেশ গুলোর ম ধ্যে ই সীমাবদ্ধ নয়। এই প্রচার কার্যে উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্বত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন কতৃক সৃষ্ট দালাল ও সমান ভূমিকা পালন করে। এভাবেই আমেরিকাসহ দাঙ্গাবাজ রাষ্ট্রগুলো উন্নয়নশীল বিশ্বের সম্পদ কৌশলে লুটে নিয়ে গরীব জনগোষ্ঠীকে একটি অভি নভ প্রকা রের দাসে পরিণত করার প্রক্রিয়া অভ্যাহত †রখেছে।

বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ব্যবস্থাপত্র উন্নয়নশীল বিশ্বে কিরূপ ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে এসেছে এর উপর একটু নজর দিলেই এসব ভ্রান্ত প্রচারের অন্তসার শূন্যতা পরিষ্কার হয়ে যাবে। নিউলিরারেলিজমের বিশ্বায়নের প্রব ক্তারা যদিও তাদের মানুষখেকো আদর্শকে আজকে দিনের বহুবিধ সংকট থেকে উত্তরণ ও দারিদ্র মোচনের একমাত্র যষ্টিমধু হিসেবে বর্ণনা করে থাকেন। কিন্তু তাদের একটি প্রজেক্ট ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তথ্য-উপাত্ত প্রয়োগ করে সফল কাম হয়েছে এমনটি দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন। তারা এসব ব্যবস্থাপত্রের প্রয়োগ উত্তর ধ্বংসাত্মক পরিণতি সমন্ধে সম্পূর্ণ নিরব রয়েছেন অথবা ইচ্ছা করে ভয়াবহ মন্দ পরিণতি গোপন রাখতে সচেষ্ট রয়েছে। ১৯৮০ ও ৯০ দশকে অনেক উন্নয়নশীল দেশ, বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী কাজ করে সংকট থেকে পার পেয়েছে এমন মুখরোচক গল্প পশ্চিমা বুদ্ধা গোষ্ঠী ও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী স্বদেশীরা জোর করে সত্য বলে চালিয়ে দিতে চায়। এক্ষেত্রে তারা প্রকৃত অবস্থাকে গোপন করে কোন রূপ তথ্য ও উপাত্ত ব্যতিরেখে কুমিরের এক বাচ্চা দেখানোর গল্পের ন্যায় শুধুমাত্র দক্ষিণ কোরিয়া ও চিলির সফলতাকে যোগ বিয়োগ করে দেখিয়ে তৃপ্তি পায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই দুই দেশের মানবাধিকার লঙনের ইতিহাস,সেনাশাসন ও সেনা বাহীনি নিয়ন্ত্রিত তথাকথিত গণতন্ত্রের কথা ছেড়ে দিয়ে তর্কের খাতিরে এই দু'টি দেশের জাতীয় প্রবৃদ্ধি বেড়েছে এবং ফলশ্রুতিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নসাধিত হয়েছে এমনটি ধরে নিলেও দক্ষিণ কোরিয়া ও চিলির ঘটনা কোনভাবেই চলমান বিশ্বায়নের নীতিমালার সাথে তুলনা করার কোন অবকাশ নেই। প্রথমে ই বলে রাখা ভাল যে, এই দু'টি দেশ নিজেদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার বিষয়টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের কাছে বন্ধক রেখে নিরাপত্তা সংশিষ্ট ব্যয়ভার রহিত কর তে গিয়ে জনগনকে পরাধীন রবোটে পরিনত করেছিল যা কিনা আজ ও অনেকাংশে অভ্যাহত আছে।

চিলির এক নায়ক পিনাচটের রাজত্বকালের (১৯৭৩-৯০) অন্তসার শূন্য উন্নয়ন বা দক্ষিণ কোরিয়ার দুর্বল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা অগ্রগতি সেই ১৯৬০ বা ৭০ এর দশকের পুরাতন কথা।তাছাড়া ঐ সময়ে চিলি ও দক্ষিণ কোরিয়া শিল্পখাতে ব্যাপক বিনিয়োগ করে। শিল্পায়নের নিরাপত্তা ও দেশীয় শিল্পকে আন্তর্জাতিক দ্রব্যের প্রতিযোগিতা থেকে দুরে রাখতে ঐ দুই দেশ আমদানির উপর ব্যাপক কর ধার্য করেছিল। আমেরিকা, যুক্তরাজ্যসহ পশ্চিমা বলয়ের দেশগুলো এক বিশেষ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কারনে দক্ষিণ কোরিয়া ও চিলির আমদানির উপর শুল্ক ধার্যের নীতিকে সহ্য করে নেয়। কিন্তু আজকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ উন্নয়নশীল দেশগুলোকে নিজেদের অভ্যন্তরীণ বাজার বিদেশী দ্রব্যের জন্য আরও ব্যাপকভাবে উন্মুক্ত করে দেয়ার জন্য প্রচন্ড চাপ রেখেছে। এত দ ব্যতীত কোন কোন উন্নয়নশীল দেশ রপ্তানি খাত থেকে কিছুটা সঞ্চয় করতে পারলেও তাও আবার সেই আগের ঋণ শোধ করতে ঐ সঞ্চয় দ্রুত চলে যায়। রপ্তানি আয় থেকে পুজি সঞ্চয়ের কোন সম্ভাবনা থাকে না এবং সেহেতু নিজেদের শিল্প খাতে পুজি বিনিয়োগের সামর্থ উন্নয়নশীল দেশগুলোর গড়ে উঠে না। অপরদিকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ধনী দেশ সমূহের মুনাফা বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে উন্নয়নশীল দেশ সমূহের রপ্তানির সম্ভাবনাকে অন্যায়ভাবে বিধি নিষেধ আরোপ করে সংকোচিত করে রাখা হয়েছে। অতঃপর অনুন্নত বিশ্বে উৎপাদিত দ্রব্য ন্যায্য মূল্য যাতে না পায় সে ব্যবস্থাও করে রাখা হয়েছে।

বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল Structural Adjustment Programme (SAF) বাস্ত বায়ন, ক্রমবর্ধমান হারে উদার বাণিজ্য নীতির প্রবর্তন, উন্নয়ন ও শান্তির ল‡ক্ষ অংশিদারিত্ব ইত্যাদি ভ্রান্ত ও নেতিবাচক ব্যবস্থাদি কার্যে পরিণত করতে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ব াধ্য করে। ফলশ্রুতিতে উন্নয়নশীল বিশ্বের আর্থসামাজিক অবস্থাকে ধ্বংস ক রা হয়েছে বা দেওলিয়া ঘোষণার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে আসা হয়েছে। অন্যদিকে, আমেরিকা উন্নয়নশীল বিশ্বকে অরাজনৈতিককরণের মধ্যদিয়ে জ্ঞান ও প্রজ্ঞাহীন করার নিমিত্তে প্রতিটি উন্নয়নশীল দেশের রাজনৈতিক প্রতিযোগিতাকে ক্ষতিকর পথে পরিচালিত করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে চলেছে। ধর্মীয় জঙ্গিবাদ ও অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব ইত্যাদিকে পৃষ্টপোষণ করে অনুন্নত দেশ সমূহের রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে অকার্যকর করে তোলাই হচ্ছে আমেরিকার মুখ্য উদ্দেশ্য।

এ কাজে আমেরিকা বা পশ্চিমা শক্তিধর দেশগুলো বা তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থা সমূহের পাশাপাশি উন্নয়নশীল বিশ্বের গণবিচ্ছিন্ন তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরাও আধা জল খেয়ে লেগে আছে। উন্নয়নশীল বিশ্বের এসব গণশত্রুরা ভাল করেই জানেন যে, বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা ওয়ার্ল্ড ট্রেইড অর্গানাইজেশন দ্বারা প্রস্তাবিত ও তাদের সৌজন্যে পরিচালিত কোন প্রকল্প গত ৩০ বৎসর সময়ের মধ্যে উন্নয়নশীল বিশ্বের কোথাও সফলতা পায়নি। SAP, অংশিদারিত্বের শান্তি ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া বা গণতন্ত্রের প্রসার ইত্যাদি মহাবানী র মারপ্যাচের প্রকল্পগুলো আজ পর্যন্ত উন্নয়নশীল বিশ্বে কোন সুফল বয়ে আনতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহিবলের বাধ্যবাধকতা য় ঐসব ভ্রান্ত প্রকল্পগুলো কার্যকরী করার ধ্বংসাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া প্রতিটি উন্নয়নশীল দেশে বেকারত্ব ও দারিদ্র বৃদ্ধি করে সমাজ কাঠামোকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছে। তারপরে ও বিশ্বের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা জ্ঞানপাপী-তস্করগন নিজেদের চুরি চামারির পথ কে সচল রাখার স্বার্থে তাদের মুনিব আমেরিকার কাছে দেশের স্বার্থকে বিক্রি করে দিতে দিদ্ধা করেনা। এসব দালাল রাজনীতিক ও আমলারা জনগনের সাথে প্রতারনা করার জন্য সদা সর্বদা নুতন নুতন বক্তব্য উপস্হাপন করে। তারা এই বলে যুক্তি দেখায় যে, আমেরিকা, বৃটিশ যুক্তরাজ্য ইত্যাদি দেশগুলো আমাদের উন্নয়ন সহযোগি, তাই তাদের কথা মত

কাজ করতে আমরা অনেকটা বাধ্য। শুধু সমালোচনার জন্য নয় বাস্তবতার নিরিখে ও নিজেদের দেশের সম্পদ অন্যত্র পাচার করে এবং জনগনের জীবিকা নির্বাহের পথ রুদ্ধকরে কোথাও কোন উন্নয়ন সাধিত হয়নি এবং কিয়ামত পর্যন্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

উন্নয়নশীল দেশের সার্বিক উন্নয়ন, দারিদ্র মোচন ও গণতন্ত্র প্রসারের সাথে সম্পর্কহীন কতিপয় নেতিবাচক পদক্ষেপকে আমেরিকা ও সারাবিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তার পদাঙ্কনোসারিয়া উন্নয়নের দিকনির্দেশনা হিসেবে উপস্থাপন করে বিশ্বের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে মোহ নিদ্রায় রাখতে চায়। বাংলাদেশের ন্যায় বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোতে দারিদ্র ও বেকারত্ব বৃদ্ধির প্রকৃত কারন সমূহকে আড়াল করে পশ্চিমা বোদ্ধারা বা তাদের আজ্ঞাবহ দেশীয় জ্ঞান পাপীরা শুভংকরের ফাঁক ফোকর দিয়ে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে বড় করে দেখিয়ে তৃপ্তি পায়। বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এসব কাগজে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কোন দেশের সাধারণ জনগণের জন্য কোন মঙ্গল বয়ে আনতে পারেনি। বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের জেদের প্রকল্প বাস্তবায়নের তিন বৎসরের মধ্যে অনুন্নত দেশের শ্রমিক-কৃষকরা তাদের পেশা থেকে বিতাড়িত হয়ে বেকারে পরিণত হওয়ার চিত্র সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। ফলস্বরূপ ভয়াবহ আকারে দারিদ্র বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস হতে হতে শূন্যের কোঠায় নেমে আসে।

পশ্চিমা বুদ্ধা গোষ্ঠী ও দুনিয়াব্যাপী তাদের তাবেদারগণ শ্রেণী সচেতনতাকে যমের ন্যায় ভয় পায়। তাদের ধারণা রাজনীতিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞা জনগণকে শ্রেণী সচেতনতার উদ্বুদ্ধ করে আর শ্রেণী সচেতনতা মানুষকে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যকার বৈরিতার কারন সমূহ চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। অর্থাৎ রাজনৈতিক জ্ঞান ও শ্রেণী সচেতনতা সমসাময়িক বিশ্বায়নের শোষণ ও নিপীড়নমূলক প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সাধারণ মানুষকে প্রেরণা ও শক্তি জোগাবে। অতএব উন্নয়নশীল বিশ্বের দরিদ্র মানুষগুলোকে অরাজনৈতিককরণের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাজনীতি বিমুখ করে নিজেদের মধ্যে ধর্ম ও গোত্র ইত্যাদি নিয়ে মারা-মারি হানাহানিতে লিপ্ত রাখে। বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ধ্বংসাত্বক প্রকল্পরাশি একের পর এক নতুন নামে উন্নয়নশীল বিশ্বে পরিচালিত করাই হচ্ছে মার্কিনি †বনিয়াদের মুখ্য ব্যাপার।

উন্নয়নশীল দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পশ্চিমাদের প্রতি মোহাচ্ছন্ন রাখার সার্থে বিভিন্ন ফন্দি ফিকিরের মারপেচে অনেক মিথ্যা বা অর্ধ সত্য তথ্যকে সত্য বলে প্রচার করা বিশ্বব্যাপি আজ চিরাচরিত নিয়মে পরিণত হয়ে গেছে। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ, উন্নয়নশীল বিশ্বের আর্থ সামাজিক অবস্থাকে ধ্বংস করে জনগণকে ঋণ দাসে পরিণত করে সারাবিশ্বকে মার্কিন প্রশাসনের প্রত্যক্ষ খবরদারিতে নিয়ে আসতে কাজ করছে। এ কাজটি করতে বেঠন উডস ইন্সটিটিউশন সময় সময় তাদের প্রকল্প ও ধারনার নীতি বদল করে নতুন নামে আবার ধ্বংসযজ্ঞ আরম্ভ করে। যেমন SAF and Partnership Agreement for Peace ইত্যাদি নামের প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অনুন্নত দেশগুলোকে ব্যর্থ রাষ্ট্রের পরিসীমানায় নিয়ে আসার পর যখন ঐসব প্রকল্পের অপকারিতা ও ধ্বংসযজ্ঞ মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে তখনই নতুন নাম দিয়ে ধ্বংসের কাজটি নুতনভাবে চাপাতে থাকে। এমন একটি প্রকল্প হচ্ছে পলিসি সাপোর্ট ইন্সট্রুমেন্টস (পি.এস.আই)। অনুন্নত বিশ্বকে ধ্বংসের নিমিত্তে পরিচালিত নুতন এই প্রকল্পটি ২০০৫ সালের অক্টোবরে আইএমএফ সৃষ্টি করে। এরপর থেকে এই স্বল্প সময়ের মধ্যে এই পিএসআইকে বাস্তবায়ন করতে আফ্রিকার চারটি দেশকে বাধ্য করা হয়। এই দেশগুলো হচ্ছে- নাইজেরিয়া, উগান্ডা, কেপ দ্যা ভার্দে ও ভার্জিনিয়া। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে ঐ চারটি দেশের জনগণকে দুইশত বৎসর পর আবার এক নুতন পদ্ধতির ক্রীত দাসে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ঐ

দেশগুলোর সর্বত্র এখন শুধু হাহাকার এবং কোথাও কোথাও প্রতিরোধের আগুন জ্বলে উঠছে। এসব দেশকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবার পর এখন শকুন-শকুনি‡দর দৃষ্টি বাংলাদেশ ও তাজিকিস্তানের উপর স্থির হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষার্থে ও আমেরিকা কর্তৃক ক্ষমতায় বসানো বাংলাদেশের সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত বর্তমান তথাকথিত অন্ত র্বর্তীকালীন সরকার ইতোমধ্যে আইএমএফ'র সাথে পিএসআই চুক্তি সাক্ষরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এ লক্ষ্যে সকল ব্যবস্থা সম্পাদন করেছে (সূত্রঃ বদর উদ্দীন ওমর, দৈনিক সমকাল, ঢাকা, উপ-সম্পাদকীয়-২১.৮.২০০৭)।

বাংলাদেশের বর্তমান অলিখিত সামরিক সরকার পিএসআই'র ন্যায় ধ্বংসত্মক চুক্তি সম্পাদন করে বাংলাদেশের জনগণকে চিরতরে মার্কিনীদের ক্রীতদাসে রূপান্তরিত করতে যাচ্ছে। এই ভেবে অনুশোচনা করার কোন কারন নাই। মূলত পৃথিবীর তথ্য-উপাত্ত থেকে এটা পরিস্কার যে, এসব ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনাকে কার্যে পরিনত করার জন্যই আমেরিকা অনুন্নত বিশ্বের দেশে দেশে জনগনের সাথে সম্পর্কহীন এসব সরকারদের বিভিন্ন নামে ক্ষমতায় বসায়।

উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিবিদরা নিজেদের জনগনের মধ্যে আস্হাশ ৃষ্টির পরিবতে' আমেরিকার ই নামের স্বপ্নে বিভোর থাকেন। এর সাথে অন্য গ্রহ থেকে আসা একদল অর্থনীতিবিদ যোগ দিয়ে বিদ্যার ফুলঝরি পুড়িয়ে আনন্দ করেন। আবার তাদের সাথে আঠার মত লেগে আছেন জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন সুশীল সমাজ নামধারী একটি গোষ্ঠী ও জনগণের দুর্দশাকে পুঁজি করে লাগামহীন মুনাফার স্বপ্নে মাতাল ভূই-ফোড় একদল ব্যবসা য়ী। তাহারা সদা সর্বত্র আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের পক্ষে অসত্য তথ্য পরিবেশন করে নিজেদের গরীব জনগোষ্ঠীর জীবন বিপন্ন করে। উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্বত্র এই স্বজাতীয় গণশত্রুরা অপবিত্র কাজ করতে গিয়ে ঘুষ, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, মাদকদ্রব্য সেবন, রাজনৈতিক গুপ্ত হত্যা, ধর্মীয় জঙ্গিবাদ, ক্লান -ট্রাইবে মধ্যকার শত্রুতাকে জাতীয়করণ করে ফেলেছে। বাংলাদেশের ব্যবসায়ী সমাজ অতি সম্প্রতি আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের বিপক্ষে মত দিয়ে মূলত দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতকে সম্মান দেখিয়েছে এ বং উন্নয়নশীল বিশ্বে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহিবলের খবরদারী ও চাপের মুখে বাস্তবায়িত কোন প্রকল্প বা কার্য প্রনালী উন্নয়নশীল বিশ্বের কোথাও কোন সুফল দেখাতে পারেনি।

এই সত্যকে উপলব্ধি করতে পিএইচডি ডিগ্রির প্রয়োজন হয় না। আরেকটি আন্তর্জাতিক সংস্থা United Nations Conference on Trede and Development-UNTACD, ২০০২ সালের রিপোর্টের উপর একটু নজর দিলে বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যাবেঃ

Structural Adiusdment Programmes (SAP) have not delivered sustainable growth sufficiant to make a significant dent in poverty(সূত্রঃ www.untacd.org/২০০২ : ১৭৪) অর্থাৎ **SAP** প্রকল্পগুলো দারিদ্র হ্রা‡স ভূমিকা রাখতে পারে এমন কোন অনুমোদন যোগ্য বা সহনীয় প্রবৃদ্ধি বাড়াতে ব্যর্থ হয়েছে।

ক্রমানুসারে ব্যর্থতার পর্যাবসিত হওয়ার পরও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থার প্রকল্প সমূহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের ইচ্ছায় উন্নয়নশীল বিশ্বে বাস্তবায়ন কর তে বাধ্য করে একদিকে ঐসব গরীব দেশগুলোকে ঋনের জালে ক্রমবর্ধন হারে আটকে দি‡''ছ আর অন্যদিকে দারিদ্র সংখ্যা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি করে দেশগুলোকে অকার্যকর রাষ্ট্রের তালিকায় স্থানান্তরিত কর ছে। আমেরিকার মডারেট সনদ সংগ্রহকারী

স্বজাতীয় গণবিরোধী ও আমেরিকার আজ্ঞাবহ সরকারগুলো শ্রমিক কৃষকদের শোষন করে, আমেরিকার ছত্রছায়ায় উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্বত্র লুটপাটের মাধ্যমে একটি নুতন চরিত্রের ধনীক শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে এবং প্রশাসন যন্ত্রকে ব্যবহার করে লুটপাটের মাধ্যমে অর্জিত ও চুরি করা সম্পদকে আইনসিদ্ধ করতে ব্যস্ত রয়েছে। আমেরিকার জেদ মেটাতে এসব গণ দুশমন সরকারগুলো উন্নয়নশীল বিশ্বের একের পর এক শিল্প কারখানাগুলো ধ্বংস করে দিচ্ছে।

অনুন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় খুটির জোরে বসে থাকা গণবিচ্ছিন্ন সরকারগুলো এমনকি আর্ন্তজাতিক শ্রম সংস্হা (আই এ ল ও ) কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ ধারা অনুমোদিত, শ্রমিকদের জীবন রক্ষার স্বার্থে নুন্যতম বেতন-ভাতা তথা শ্রমিকদের জন্য একটি বেতনক্রম নির্ধারণ করা থেকে বিরত থাকে। অনুন্নত বিশ্বের এসব স্বজাতীয় সরকারগুলো তাদের বিদেশী-মুনিবদের ইচ্ছানুযায়ী শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার তথা নিয়মতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখতে তৎপর রয়েছে। বাংলাদেশসহ সকল অনুন্নত দেশগুলোতে একের পর এক শিল্প কারখানা ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে। এসব তাবেদার সরকারগুলো কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করার কুমতলবে প্রথমে প্রশাসনের পক্ষ থেকে দালাল লেলিয়ে দিয়ে শ্রমিকদের হানাহানিতে লিপ্ত করে এবং দীর্ঘদিন শ্রমিকদের বেতন ভাতা প্রদান না করে আন্দোলনে যেতে বাধ্য করে। পরে কৌশলে শিল্প কারখানাটি অলাভজনক দেখিয়ে রুটিন মাফিক একের পর এক কারখানা বন্ধ করে চলছে।

নিউলিবারেল বিশ্বায়নের যাতাকলে পিষ্ট অনুমাত্র উন্নয়নশীল বিশ্বের (Least Developed Countries-LDC) কৃষকরা উৎপাদিত প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ যথা-চাল, গম,কপি, চা, পাঠ ইত্যাদি ন্যায্য মূল্যের নিচে মুক্ত বাণিজ্যের ধারায় পশ্চিমা মোড়লদের দ্বারা নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করতে হয়। পশ্চিমা ধনী দেশগুলো প্রতিদিন গড়ে ১.০ বিলিয়ন ডলার নিজ নিজ দেশের কৃষি খাতে ভূর্তুকি দিয়ে থাকে। (সূত্র : www.maketradefair.com). অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থাগুলো (IFIS) উন্নয়নশীল দেশগুলোকে নিজেদের কৃষিখাতে ভুর্তুকি না দেয়ার জন্য ব্যবস্থা পত্র দিয়ে চাপ অব্যাহত রেখেছে। এদিকে, উন্নয়নশীল বিশ্বের নতজানু সরদারগুলো তাদের পশ্চিমা পালক পিতাদের খুশী রাখতে মিথ্যার আশ্রয় নেয়। গরীব দেশগুলোর কৃষিখাতে ভুতুর্কি দেয়ার সামর্থ নেই, এমন সব দৈব্যবাণী উপস্থাপন করে তাবেদার সরকারগুলো কৃষিখাতে ভুর্তুকি দেয়া থেকে বিরত থাকে। তাছাড়া অনুন্নত দেশের কৃষককে জীবন ও জীবিকার সাথে সম্পর্কিত কৃষি উপকরণ সমূহ ন্যায্যমূল্যে ও সহজ উপায়ে সরবরাহ না করে কৃষকদের সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদিসহ সকল ন্যায্য দাবী-দাওয়াকে পুলিশ ও গুন্ডা লেলিয়ে দিয়ে স্তব্ধ করা হয়ে থাকে। এসব ধ্বংসাত্মক পন্থা অবলম্বন করে অনুন্নত বিশ্বের আমেরিকার আজ্ঞাবহ সরকারগুলো শিল্পের ন্যায় কৃষিখাতকে ও ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছে।

অনুন্নত বিশ্বের মার্কিন প্রশাসনের স্বার্থ রক্ষাকারী ঐসব সরকারগুলো উন্নয়ন, সংস্কার ও দুর্নীতি দমন প্রভৃতি স্পর্শকাতর বানী আওড়িয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে এবং বিভিন্ন কৌশলে নিজেদের ক্ষমতায় স্থায়ীত্ব বাড়াতে ব্যস্ত থাকে। আবেগ জড়িত সময় কেটে যাবার পর এসব সরকার জনসাধারণের বিরোধিতায় সম্মুখীন হয়। এসব সরকার নিজ নিজ দেশের গণমানুষের দাবীকে উপেক্ষা করে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ এর ব্যবস্হাপত্রানুযায়ী আর্ন্তজাতিক অর্থনৈতিক সংস্হা সমূহের সাথে নতুন নতুন চুক্তি সাক্ষর করে প্রতিটি দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থাকে ধ্বংস করার মানসে কাজ করে |জনগণের আশা-আকাংখার বিরুদ্ধে কাজ করতে গিয়ে ঐসব সরকারগুলো একের পর এক নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে ক্ষমতা

গ্রহণের কিছুদিন যেতে না যেতেই গণদুশমনে পরিণত হয়। কিন্তু চিরদিন কেউ কাউকে বোকা বানিয়ে রাখতে পারে না। জনগণ জীবন-জীবিকার দাবিতে একত্রিতহতে থাকে এবং এক পর্যায়ে সরকার হটানোর বৃহত্তম আন্দোলন গড়ে উঠে। আর তখনই মার্কিনী যুক্তরাষ্ট্রের পৃষ্টপোষনে জীবিত চামচিকা রাজনীতিক ও অন্নান্য জ্ঞাণপাপীরা †দাঁড়ঝাঁপ আরম্ভ করেন| †কান কোন অনুন্নত দেশে মাঝে মধ্যে নির্বাচনের লম্পঝম্প দেখা গেলেও এসব নির্বাচন সাধারণ জনগণকে আবারও বোঝা বানানোর একটি নতুন কৌশলমাত্র। এসব নির্বাচনে কোথাও জনগণের দাবি-দাওয়ার প্রতি শ্রদ্ধাশীল কোন ব্যক্তি টাকা ও †পশীশক্তির অভাবে নির্বাচিত হতে পারে না। অনুন্নত দেশের সরকারগুলো তথাকথিত নির্বাচিত না খুটির জোরে বসে থাকা এতে তেমন কিছু আসে যায় না। গণতন্ত্রের প্রাথমিক নীতিমালা লঙ্গন করে অনুন্নত বিশ্বের আর্থ সামাজিক অবস্থার সাথে জড়িত জরুরি সিদ্ধান্ত সমূহ মূলত আমেরিকা বা পাশ্চাত্যের অন্যকোন ধনী দেশের রাষ্ট্রদূতের শরীর থেকে প্রসবিত হয় বা বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের তথাকথিত বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে আসে।

জনরোষ প্রতিরোধে রূপান্তরিত হওয়ার লক্ষ্য দেখামাত্র কিছুটা প্রসাধনিক প্রলেপ এঁটে কিছু নতুন মুখের সমাগম ঘটিয়ে লুণ্ঠন অব্যাহত রাখার সাধারণ পদ্ধতি ব্যবহার করে হয়। অন্যদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ ও লুণ্ঠন অব্যাহত রাখা তথা আমেরিকায় জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ ও বর্ধিতকরণ হচ্ছে আজকের দিনের বিশ্বায়নের মুখ্য মন্ত্র। পৃথিবীর কোথাও, যে কোন দেশে, আমেরিকার জাতীয় স্বার্থ ঠিকটাক মত বর্ধিত হচ্ছে না এমনটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের চিন্তায় আসামাত্র কৌশল ও শক্তি প্রয়োগ করে সেসব দেশের সরকার বদল করে নিজেদের পুতুলদের বসিয়ে (Regime change) লুণ্ঠন অব্যাহত রাখা হয়। তবে ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হগো শেভেজের ঘটনা (২০০২) প্রমাণ করে যে, যত ক্ষুদ্র দেশই হোক না কেন জনগণকে সাথে নিয়ে ও জনগণের স্বার্থে কাজ করলে জনগণই তাদের সরকারকে রক্ষা করে এবং সেসব সরকারের কাছে আমেরিকার দানবীয় চক্রান্ত ষড়যন্ত্র ও হারমানে। এমনকি আমেরিকার আজ্ঞাবহ সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ ও অকার্যকর হয়ে পড়ে।

তথ্য উপাত্ত ঘাটাঘাটি করলে দেখা যায়, গত শতাব্দীর প্রথম দিকে বিশ্ব রাজনীতির নিয়ামক শক্তি হিসেবে অভির্ভূত হওয়ার পর থেকে আমেরিকা গুপ্তহত্যা, জোরপূর্বক অন্য দেশের সরকার বদল ও যুদ্ধ অব্যাহতভাবে চালিয়েই আসছে। নিজেদের জাতীয় স্বার্থকে নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে অন্যদেশের আভ্যন্তরিন বিষয়ে হস্তক্ষেপ এবং বিশ্বব্যাপী দালাল পোষা মার্কিন প্রশাসনের কর্ম-সংস্কৃতির একটি অংশ। এরই অংশ হিসেবে উন্নয়নশীল বিশ্বের তথাকথিত শিক্ষিত, সামরিক ও বেসামরিক জ্ঞান-পাপীদের মাঝে মধ্যে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থা সমূহে খন্ডকালীন চাকরির ব্যবস্থা করে বা নৈপুনতা বৃদ্ধির নামে বিদেশ ভ্রমনের সুযোগ করে দেয়া হয়। এভাবেই আমেরিকা উন্নয়নশীল বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মিরজাফরদের উপঢৌকন ও ভাতা দিয়ে নৈতিক ও অর্থনৈতিকসহ সকল প্রকার দুর্নীতিকে পোষন করে। আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের পাশাপাশি পশ্চিমা ব্যক্তিগত কোম্পানীগুলো পর্যন্ত উন্নয়নশীল বিশ্বের আমলা, অসৎ রাজনীতিবিদ ইত্যাদিকে ঘুষ দিয়ে বড় বড় কাজগুলো বাগিয়ে নিয়ে মোটা অংকের টাকা লুটে নিয়ে যায় এবং দুর্নীতিকে সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে। ঘুষ-দুর্নীতির মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করতে পারদর্শী পশ্চিমা বুদ্ধারা আবার উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোকে অগণতান্ত্রিক, দুঃশাসনে নিমজ্জিত ও দুর্নীতিগ্রস্ত ইত্যাদি বিশেষনে বিশেষিত করে শিক্ষকের ভূমিকায় অভিনয় করতে লজ্জা পায় না।

অবশ্যই দুর্নীতি একটি মারাত্মক ব্যাধী এবং HIV-AIDS এর চেয়েও ভয়ঙ্কর। কোনভাবেই দুর্নীতি নামক এই ভয়ঙ্কর ব্যাধীকে প্রশ্রয় দেয়া যায় না। দুর্নীতি কোথায় সংঘটিত হচ্ছে পূর্বে না পশ্চিমে উত্তরে

না দক্ষিণে এটা বড় কথা নয়। মূল কথা হচ্ছে, দুর্নীতিকে অবশ্যই নিন্দা জানাতে হবে এবং এ থেকে নিস্তার পাবার সকল উপায়কে অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে। তবে পক্ষপাত দোষে দুষ্ট এক পেশে প্রতিবেদন ইত্যাদি উপস্থাপন করে আঘাতের পর আঘাত সহ্য করতে করতে অনুন্নত বিশ্বের ধ্বংস প্রায় আর্থসামাজিক অবস্থাকে আরেকবার চূড়ান্ত আঘাত করার হীন উদ্দেশ্যে অপপ্রচার অনেক প্রশ্নের জন্ম দেয়। দুর্নীতির সংজ্ঞা কি এবং কত প্রকার ও কি কি ইত্যাদির বিশ্লেষণ করা এই পরিসরে আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে পশ্চিমের গণতান্ত্রিক দেশগুলো কতটুকু দুর্নীতি মুক্ত সে বিষয়ে সংক্ষেপে হলেও একটি ধারনা থাকা উচিত। মূলত অনেকগুলো পশ্চিমা দেশ গণতান্ত্রিক নীতি বিরুধী বা সময় সময় অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। ২০০০ সালের আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন যে, গণতান্ত্রিক ছিল না, সেটা বিশ্ববাসীর স্মরনে থাকার কথা। ব্যালটের পরিবর্তে কোর্টের রায় অলৌকিকভাবে G.W. Bush কে প্রেসিডেন্ট করেছিল। ইউরোপিও কমিশনের অনেক অনিয়ম ও আর্থিক কেলেংকারীর ঘটনা নতুন কিছু নয়। এছাড়া ইটালীর অনেক সময় কালের প্রধানমন্ত্রী, মিডিয়া মোঘল, সিলভিও বেলুস করনি, কিভাবে রাষ্ট্রীয় ও কর্পোরেট ক্ষমতাকে দখল করে ইউরোপে স্মরনকালের একটি রাজনৈতিক দুর্নীতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ছেন। তাছাড়া কোম্পানী-কর্পোরেশনে দুর্নীতি ইউরোপ-আমেরিকার একটি অপেন-সিক্রেট ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। সময় সময় স্বয়ং পশ্চিমা মিডিয়ায় এইসব অনিয়ম ইত্যাদির খবর প্রকাশ পায় এবং প্রশাসনিক প্রলেপও এঁটে দেয়া হয়ে থাকে। শুধু অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সাথে জড়িত বিষয়াদি দুর্নীতি নয়। মন ও আত্মার উপর কলোপ লাগিয়ে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য প্রভাব খাটানো নৈতিকতা বিবর্জিত কাজ ও দুর্নীতির সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে।

নিউলিবারেলিজমের অমানবিক বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে বাস্তবায়ন করতে †যসব আন্তর্জাতিক সংস্থা সরাসরি জড়িত †সসব প্রধান প্রধান কয়'টির উপর একটু নজর দেয়া যাক:-

১) এদের প্রথমেই যে নামটি আসে, সেটি হচ্ছে বিশ্বব্যাংক (World Bank-WB) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত ইউরোপের দেশগুলোতে পুনর্বাসন কাজের ব্রত নিয়ে প্রথমে বিশ্বব্যাংক স্থাপিত হয়। তারপর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাংক এর মৌলিক কাজের বাইরে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদা নের কাজটি করতে আরম্ভ করে। বিশ্বব্যাংকের সদর দপ্তর নিউইয়র্ক অবস্থিত এবং আমেরিকার প্রশাসন কর্তৃক নিযুক্ত একজন এপোয়েন্টি কর্তৃক ব্যাংক টি পরিচালিত হয়।

২) আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (International Monetary Fund-IMF) নাম বিশ্বব্যাংকের পরেই আসে। বিশ্বব্যাংকের ন্যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক বিনিময় বাজারের হার দৃঢ়বদ্ধ রাখতে এবং মুক্ত বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে স্থাপিত হয়। যেসব দেশের আমদানি ব্যয় রপ্তানি ব্যয়ের চেয়ে বেশি অর্থাৎ স্বল্প মেয়াদি ব্যালেন্স অব প্যামেন্ট সমস্যার মধ্যদিয়ে অগ্রসর হচ্ছে এমন সব দেশকে আইএমএফ, নীতিগতভাবে ঋণ প্রদানের কাজটি করে থাকে। এছাড়া ঋণের বোঝা ও দারিদ্রের চাপ থেকে যেসব দেশের উত্তরণের সম্ভাবনা বিলীন হয়ে ব্যর্থ রাষ্ট্রের দিকে ধাবিত হয় সেসব দেশকে আইএএমএফ ঋণ দিয়ে থাকে। আইএমএফ'র সদর দপ্তর ও বিশ্বব্যাংকের ন্যায় নিউইয়র্ক অবস্থিত এবং ইউরোপিও দেশগুলোর দ্বারা নিযুক্ত একজন এপয়নটির ধারা পরিচালিত হয়।

৩) জি-৮ (Group of Eight Countries-G 8) পৃথিবীর সাতটি প্রথম ধনী দেশ যথাক্রমে ইটালী, আমেরিকা, বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানী, জাপান, কানাডা (১৯৭৬ থেকে) এর সাথে রাশিয়াকে (১৯৯৮ থেকে) ধরে জি-৮ বুঝানো হয়। জি-৮ এ পৃথিবীর প্রথম সারির ক্ষমতাশীল দেশগুলো মধ্যে অন্যতম রাশিয়া থাকলেও কেবলমাত্র জি-৭ সদস্য দেশগুলো (অর্থাৎ রাশিয়া ব্যতিত) নিতান্ত গরিব দেশগুলোর (লিস্ট ডে ভ‡লাপড) ঋন বিলপ্ত বা এব্যাপারে যেকোন ধরনের সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষমতা রাখে। প্রসঙ্গক্রমে

উলেখ্য যে, বহুজাতি কর্পোরেশনগুলো (Transnational Corporations-TNC's / Multinational Corporations-MNC's) সাধারণত এইসব জি-৭ভূক্ত দেশগুলোতে সদর দপ্তর রেখে বিশ্বব্যাপী সহজলভ্য কাচামাল হইতে শিল্প সম্মত উপায়ে শিল্প দ্রব্যের কারখানা স্থাপন করে এক চেটিয়া ব্যবসা করে আসছে। যেমন নাইক-Nike, কোকাকোলা-Coca Cola, জেনারেল মটরস ইত্যাদি। ওইসব অনেক কোম্পানীর বাৎসরিক উপার্জন সম্মিলিতভাবে বহুদেশের একত্রিত উপার্জনের চেয়েও বেশি।

৪) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization-WTO) একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং ১৪৮টি দেশ এই সংস্থার সদস্য। এই সংস্থার সদস্য দেশ সমূহের মধ্যকার বাণিজ্য নীতির মূল্যায়ন ও দেখাশোনা করে। এই সংস্থার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা হ্রাস করা ও চূড়ান্ত পর্যায়ে উচ্ছেদ করা। সংস্থার সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত। এই সংস্থা সময় সময় সদস্য দেশগুলোর মন্ত্রী পর্যায়ের মিটিং আয়োজন করে থাকে। এইসব মিটিং-সমাবেশ †বশ কয়েক বৎসর যাবত উন্নয়নশীল বিশ্বের কাঁচামালের ন্যায্য মূল্য প্রদান এবং বিশ্ববাজারে উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার নিমিত্তে অবাধ বাণিজ্যের স্থলে ন্যায়ভিত্তিক বাণিজ্য নীতি (Fair trade) প্রণয়নের দাবিতে ব্যাপক আকারের গনজমায়েত এবং প্রতিবাদ মিছিল ইত্যাদির সম্মুখীন হয়ে আসছে। যেমন Seatle 1999 এবং কান কুন ২০০৩ ইত্যাদি।

এই বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল সৃষ্টির কাহিনীর সাথে আবার বেঠনউডস ইন্সটিটিউটস জড়িত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে ১৯৪৪ সালে একটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সিস্টেম পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মিত্র শক্তিভুক্ত ৪৪টি স্বাধীন দেশের ৭৩০ জন ভেলিগেট Bretton woods Newhamshire এর মাউন্ট ওয়াশিংটন হোটেলে এক নাগাড়ে জুলাই মাসের প্রথম তিন সপ্তাহব্যাপী আলাপ-আলোচনার পর বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের জন্ম হয়। সেই কারনে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ Bretton Wood Institutions নামে পরিচিত। এছাড়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থা সমূহ (International Financial Institutions -IFI) সাধারণতঃ বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়।

উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোকে ঋণের জালে আটকে রাখার কাহিনী:

এ দিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মধ্যদিয়ে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলো এবং বিশেষ করে ৬০ এর দশকের শেষের দিক থেকে বাংলাদেশের ন্যায় স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলো কিভাবে ঋনের জালে আটকা পড়ে অনুন্নত বিশ্বে বা তলাহীন ঝুড়িতে পরিণত হল এর ও একটি কাহিনী আছে। চলুন এ বিষয়ে একটু আলোকপাত করা যাক। উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশগুলো কিভাবে ঋন সংকটে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে এবং এর ফলশ্রুতিতে কিভাবে বাণিঝ্য ঘাটতির শিকারে পরিণত হয়ে স্থায়ীভাবে শুধু উন্নত বিশ্বের কাচামালের যোগানদারের ভাগ্য বরণ করতে হয়েছে ও উন্নত বিশ্বের তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে সে ইতিহাস খুবই বিচিত্র। আর এই বিচিত্র ইতিহাসটি ১৯৭০ দশকের তেল সংকটের সাথে সম্পর্কিত। ৭০ দশকে তেল উৎপাদনকারী দেশগুলো হঠাৎ করে তেলের মূল্য বাড়িয়ে দিয়ে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি বাড়তি আয় করে। অন্যদিকে আবার অধিকাংশ তেল উৎপাদনকারী †দশগুলোর ব্যক্তি স্বাধীণতার বিরুধীতাকারী (অথোরেটিয়ান) সরকারগুলো নিজেদের জনগণের আর্থিক অবস্থার সার্বিক উন্নয়ন সাধনকে সরকারের জন্য বিপদজ্জনক হিসেবে বিবেচনা করার কারনে ব্যাংক-বীমা স্থাপনসহ রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো সেই অর্থে গড়ে তুলেনি। তাই স্বাভাবিকভাবে পশ্চিমা মুনিবদের মন্ত্রে চালিত অধিকাংশ তেল

উৎপাদনকারী দেশের সরকারগুলো তেলের মূল্য বৃদ্ধিতে উপার্জিত বাড়তি আয়ের টাকা পশ্চিমা বিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে জমা রাখে। এই ব্যাংকগুলো আবার উন্নয়নশীল ও নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত যেসব দেশ নিজেদের উন্নয়নে আগ্রহ প্রকাশ করে তাদেরকে ঋন গ্রহনে রাজী করিয়ে কিছুটা কম সুদের হারে ঋন প্রদান করে। এরপর কোন এক অদৃশ্য সূতার টানে(আর্ন্তজাতিক অর্থনৈতিক সংস্হা সমূহ এ বং তাদের পিছনের রাজনৈতিক চালিকাশক্তি আমেরিকার চালে) ৭০ ও ৮০ দশকে হঠাৎ করে চিনি, কপি, টিন, চা, পাট, ফলমূলসহ অন্যান্য কাঁচামালের মূল্য নাটকীয়ভাবে পড়ে যায়। এর ফলশ্রুতিতে পশ্চিমা বিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋন গ্রহিতা দেশগুলোর আয় ব্যাপক হ্রাস পায়। অন্যদিকে, এই সৃষ্ট সুযোগে ঋন প্রদানকারী ব্যাংকগুলো সুদের হার অযৌক্তিকভাবে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করতে থাকে এই হচ্ছে সংক্ষেপে ঋন সংকট আরম্ভের বিচিত্র ইতিহাস।

এই সংকটের সূত্রধরে ঋনের জালে আটকে পড়া মেক্সিকো ১৯৮২ সালে ঋন পরিশোধ করতে প্রথমে অপারগতা প্রকাশ করে। এরপর ঋনগ্রস্ত দেশগুলোকে দেওলিয়া ঘোষণা করা থেকে উদ্ধারকল্পে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এক অভিনব ধরনের প্যাকেজ নিয়ে আ ভির্ভূত হয়। এই প্যাকেজের আওতায় ঋনগ্রস্ত দেশগুলোকে পুরাতন ঋন পরিশোধের নিমিত্তে নুতন ঋ ণের তফসিল কষে দেয়া হয় এবং নূতন ঋ ণের তফসিলের সাথে কিছু ভিন্নধর্মী শর্ত জুড়ে দেয়া হ য়। এই শর্তানুযায়ী আন্ত র্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থা সমূহের (IFIs) প্রস্তাবিত নিউলিবারেল কার্য প্রনালী ঋন গ্রহিতা দেশগুলোকে বাস্তবায়ন করতে বাধ্য করা হ য়। ফলশ্রুতিতে অনুন্নত বিশ্বের দেশগুলো র স্থানীয়ভাবে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের স্বার্থে নীতি প্রনালী গ্রহণ করার প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল এবং উত্তরের একচেটিয়ে মুনাফা শিকা রী †মাড়লদের খপ্পরে স্থায়ীভাবে আটকে পড়ল।

এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্বত্র নাটকীয়ভাবে দারিদ্রের হার বাড়তে থাকে। জনগণের খাদ্য, চাকুরি ও জীবিকার নিরাপত্তা দ্রুতগতিতে ধ্বংসের পথে ধাবিত হয় । অনুন্নত বিশ্বের গরীব দেশগুলো র উৎপাদিত দ্রব্য প্রক্রিয়াজাত করে শিল্প দ্রব্যে রূপান্তরের মাধ্যমে ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দিয়ে কেবল মাত্র পানির দামে (উন্নত বিশ্বের বেনিয়া গোষ্ঠী কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে) কাঁচামাল রপ্তানি করতে বাধ্য করা হয়। এর পাশাপাশি আবার উন্নয়নশীল বিশ্বের স্টক এক্সচেঞ্জ প্রক্রিয়ার মাঝে মধ্যে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে মুদ্রামানকে ধ্বংস করার পাঁয়তারা চলতে থাকে। এই হীন প্রক্রিয়ায় উদ্দেশ্যমূলকভাবে একের পর এক দেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করার ঘৃন্য ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, হংকং, ভেনিজুয়েলাসহ প্রায় সব ক'টি উন্নয়নশীল দেশ এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

এসব ষড়যন্ত্র চক্রান্তের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থার বিশ্বায়নের পক্ষে মার্কিনী বুদ্ধারা উন্নয়নশীল বিশ্বের অর্থনৈতিক কাঠামোতে বলিষ্ট ভূমিকা রাখতে সক্ষম এমন সব শিল্প কারখানাকে বিভিন্নভাবে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে আমেরিকার অনুমোদিত নতজানু সরকার সমূহ দিয়ে বন্ধ করে চলছে। শিল্প কারখানা বন্ধের পাশাপাশি প্রতিটি উন্নয়নশীল দেশের এবং বিশেষ করে ঋনের বোঝা ও সৃষ্ট দারিদ্রের কষাঘাতে বিক্ষত দেশগুলোর গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ও খাতকে যেমন বিমানবন্দর, সমুদ্র বন্দর, রেলওয়ে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ইত্যাদি খাতকে প্রথমে তথাকথিত ব্যক্তিমালায় নিয়ে যেতে চাপ শৃষ্টি করে এবং পরবর্তীতে পশ্চিমা কোম্পানীগুলো পর্যায়ক্রমে একের পর এক দখল করে নেয়। ঐসব অপকর্মের পরিণতিতে প্রতিটি অনুন্নত দেশের লক্ষ কোটি, কৃষক ও কর্মজীবীরা চাকুরি হারিয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে অনাহারে অর্ধাহারে ও চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। মজার বিষয় হচ্ছে

যে, বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল অনুন্নত বিশ্বে নিজেদের তাবেদার প্রশাসন সরকারকে কলকারখানা ইত্যাদি বন্ধ করে দেয়ার নিমিত্তে ঋন নিতে বাধ্য করে। এই ঋনের টাকা পরে লুটেরা সরকারগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়। এই ঋনের টাকায় একটি অতি নগন্য অংশ আবার চাকুরিচ্যুত কিছু সংখ্যক শ্রমিকদের 'গোল্ডেন হ্যান্ডশেক' নামে দেয়ার কৌশল নিয়ে গোটা শ্রমিক গোষ্ঠীর সাথে প্রতারণা করে চলছে।

কলকারখানা বন্ধের পাশাপাশি অনুন্নত দেশের স্বার্থের পরিপন্থী বাণিজ্য নীতি চাপিয়ে দিয়ে কিভাবে পশ্চিমা মোড়লরা অনুন্নত বিশ্বের দেশগুলোর রপ্তানি খাত থেকে আয়ের সম্ভাবনা বন্ধ করে দিয়েছে এর উপর একটু নজর দেয়া যাক;

প্রথমতঃ চলমান নিউলিবারেল বিশ্বায়নের বাণিজ্য নীতি উন্নয়নশীল দেশের স্বার্থকে হিসেবের বাহিরে রেখে কেলবমাত্র উন্নত বিশ্বের লুটপাট ও অসম বাণিজ্য নীতিকে আইনি স্বীকৃতি দিতে দৃশ্যতঃ প্রণয়ন করা হয়েছে। অনুন্নত দেশগুলো বর্হিবাণিজ্য থেকে অর্জিত আয়কে যাহাতে সামাজিক খাতে ব্যবহার না করতে পারে সেজন্য রপ্তানিকে সংকোচিত করা তথা অনুন্নত বিশ্বের বর্হিবাণিজ্যকে সংকোচিত করার লক্ষ্যে এটে দেয়া বাধা বিপত্তির কিছু স্বরূপ নিম্নে উদৃত হল:-

১) ধনী দেশগুলো নিজ নিজ দেশের কৃষিখাতে দৈনিক ১ বিলিয়ন ডলার ভুর্তুকি দিয়ে কৃষিজাত পণ্যকে সহজলভ্য ও অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে বিক্রি করে বহির্বানিজ্য নিয়ন্ত্রনে রাখার সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করে রেখেছে। অপর দিকে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থা (বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ) কৃষি খাতে ভুর্তুকি না দেয়ার ব্যবস্থাপত্রে বাধ্য করে রেখেছে। তাছাড়া অনুন্নত দেশগুলোর সরকার অনেক সময় অর্থের অভাবজনিত কারন দেখিয়ে কৃষিখাতে ভুতুর্কি দিয়ে চাঙ্গা করতে অনীহা দেখায়। স্বাভাবিক কারনে অনুন্নত বিশ্বের গরীব কৃষককূল চড়া মূল্যে উৎপাদনের উপকরণ সমূহ ক্রয় করতে হিমশিম খায় বা অনেক সময় কিনতে পারে না। ফলশ্রুতিতে গরীব দেশগুলোর কৃষককূলের উৎপাদিত পণ্য আমদানীকৃত কৃষিজাত পণ্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করা অত্যাবশক হয়ে দেখা দেয়। তবে মুক্ত বাণিজ্য নীতির আওতায় নানাবিধ ফাঁকফোকর আবিষ্কার করে অনুন্নত বিশ্বের কৃষকদেরকে নিজেদের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য নির্ধারনের অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ কর্তৃপক্ষ মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। সেই কারনে অনুন্নত বিশ্বের কৃষকদের উৎপাদন খরচের সাথে সমন্বয় করে আমদানিকৃত কৃষি পণ্যের চেয়ে বেশি দামে নিজেদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রির কোন সুযোগ নেই। আর এই কারনে গরীব দেশের কৃষকরা মুক্ত বাণিজ্যের বাজারে টিকতে পারে না। এই প্রক্রিয়ার শেষ পর্যন্ত অনুন্নত বিশ্বের গরীব কৃষকরা নিজেদের পেশা থেকে উৎখাত হয়।

২) বাজারে প্রবেশাধিকার (Market Access): উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রক্রিয়াজাত ও শিল্পসম্মত উপায়ে প্রস্তুত পণ্যের উন্নত বিশ্বের বাজারে প্রবেশাধিকার খর্ব করার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ব্যবস্থাপত্রানুযায়ী অযৌক্তিকভাবে উন্নত দেশ সমূহে উচ্চহারে আমদানি কর প্রয়োগ করে রাখা হয়েছে। অন্য কথায়, মূলত-উন্নয়নশীল বিশ্বে প্রক্রিয়াজাতকৃত এবং শিল্প সম্মত উপায়ে প্রস্তুত পণ্যের উন্নত বিশ্বের বাজারে প্রবেশাধিকার বিভিন্ন মারপেচের মাধ্যমে প্রায় বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এই হীন চক্রান্তের একটি মাত্র উদ্দেশ্য আর তা হচ্ছে উন্নয়নশীল বিশ্বকে কেবল নামমাত্র মূল্যে উন্নত বিশ্বের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল যোগান দিতে ব্যস্ত রাখা।

৩) দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ (Commidity Prices) : মজার ব্যাপার হচ্ছে, বৈষম্যমূলক বাণিজ্যের মাধ্যমে সঞ্চিত অর্থে ধনী হয়ে উঠা উন্নত বিশ্ব শুধু নিজেদের তৈরি দ্রব্যের ইচ্ছানুযায়ী মূল্য নির্ধারণ করে তৃপ্ত থাকতে চায় না। তারা অনুন্নত বিশ্বে উৎপাদিত কাঁচামালের উপরও মূল্য নির্ধারণের আইনি ক্ষমতা কেবল

নিজেদের মধ্যে সংরক্ষিত করে রেখেছে। একটি উদাহরণের উপর নজর দিলে দেখা যাবে যে, এই বৈষম্যমূলক যুক্ত বাণিজ্যের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে এবং উন্নয়নশীল বিশ্বকে কিভাবে শোষনের শিকার হতে হয়। ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০২ পর্যন্ত কফির মূল্য ৬.৭ হারে পড়ে যাওয়াতে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোকে ৮ (আট) বিলিয়ন ডলার ক্ষতি গুণতে হয়েছে (সূত্রঃ www.marketradefair.com/www.oxfam.org)। প্রকৃতপক্ষে ঐ পাঁচ বৎসর সময় ধরে কফি উৎপাদনকারী দেশগুলোতে আট বিলিয়ন ডলার সামাজিক খাতে খরচ করতে পারলে তাদের নিজ নিজ সমাজের দারিদ্রতাকে নির্বাসনে পাঠাতে সম্ভব হত।

৪) কৃতি সত্ত্বের নিরাপত্তা বিধান (Patent Protection) : এই নিয়ম বর্হিভূত ও নৈতিকতা বিবর্জিত নীতির কারনে বাধ্য হয়ে উন্নয়নশীল বিশ্বকে বাৎসরিক চলিশ বিলিয়ন ডলার ক্ষতি শিকার করতে হয়। এক চেটিয়া মুনাফা গুণার লক্ষ্যে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো কৃতি সত্ত্বের নিরাপত্তা বিধানের নামে এইসব প্রহসনমূলক নীতিমালা আমেরিকার রাজনৈতিক শক্তির জোরে বলবৎ করে রেখেছে। এই কৃতি সত্ত্বেও নিরাপত্তা বিধান করতে গিয়ে তাহারা আবার উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য দু'টি পৃথক নীতি প্রয়োগ করে রেখেছে। বহুজাতিক কোম্পানীগুলো উন্নয়নশীল বিশ্বের স্বদেশী ও স্থানীয় জ্ঞান এবং প্রথাকে কাজে লাগিয়ে কোন নুতন দ্রব্য উৎপাদন করলে স্থানীয় জ্ঞান ও প্রথাকে শ্রদ্ধা না দেখিয়ে এইসব উৎপাদিত দ্রব্যের কৃতি সত্ত্ব নিজেদের নামে রেখে দিয়েছে। অন্য কথায়, এই প্রক্রিয়ায় উন্নয়নশীল বিশ্বের জ্ঞান ভান্ডার বা প্রথাগত অবস্থান থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে মুল্যহীন করে দেয়া হয়েছে। নুত ন আকা রের বা প্রণালীয় বাসমতি চাল ও আয়ূর্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতির উপর একটু আলোকপাত করলে ই সত্য বাহির হয়ে আসবে। বাসমতি চালের উৎপাদন বা আয়ূর্বেদী চিকিৎসা পদ্ধতি শত শত বৎসরের পুরনো ব্যাপার। স্বদেশী জ্ঞান ও প্রথা এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে আসছে। সামান্য একটু আধটু প্রসাধনিক প্রলেপ এঁটে দিয়ে নুতন প্রণালীয় বাসমতি চাল বা আয়ূর্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতির কৃতি সত্ত্বের অধিকার বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর নামে নিয়ে যাওয়া শুধু অন্যায় বা অবিচার নয়। বরং এটা অন্যের সম্পদ লুণ্ঠনের নামান্তর।

সাহায্য সংস্থা সমূহের (Aid Agencies) গবেষণালুব্ধ হিসেব থেকে দেখা যায়। পূর্ব ও দক্ষিন এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলো র রপ্তানি বাৎসরিক মাত্র এক পার্সেন্ট (১%) হারে বাড়াতে সক্ষম হলে কমপক্ষে বৎসরে ১২৮ মিলিয়ন মানুষকে দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্তি দেয়া যেত (সূত্রঃ www.debtireland.org/debt-issues/index.htm)। প্রকৃতপক্ষে উন্নত দেশগুলো গরীব দেশগুলোকে ১ ডলার এইড দেয়ার বিপরীতে অনুন্নত বিশ্বের রপ্তানি বাণিজ্যের উপর অন্যায় বাণিজ্য নীতি চাপিয়ে দিয়ে এবং গরীব দেশগুলোর রপ্তানির সম্ভাবনাকে বন্ধ করে দিয়ে দুই ডলার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। অনুন্নত দেশগুলোর ঋনের বুঝা এবং তাদের উপর চা পিয়ে রাখা অন্যায় বাণিজ্য নীতি গরীব দেশগুলোতে দারিদ্র বৃদ্ধি ও উন্নয়ন ব্যাহত করার প্রধান কারন (সূত্র ঃ www.maketradefair.com)।

নিউলিবারেল বিশ্বায়নে র অংশ হিসেবে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহিবলের ব্যবস্থাপত্রে পরিচালিত মাথাভারী প্রকল্পগুলো একের পর এক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে উন্নয়নশীলে বিশ্বে দারিদ্র নাটকীয় হারে বৃদ্ধি করেছে। এত কিছুর পরও উন্নত বিশ্বের মানুষ খাদকরা ক্ষান্ত হয়নি। পূর্বথেকে চলে আসা †য কোন প্রকল্পের ব্যর্থতার ইতিহাসকে পাশ কাটিয়ে আবার সেই সুশাসন, স্বচ্ছতা, দুর্নীতি দমন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির নামে মিলিয়ন ডলার মূল্যের উপদেশ দিতে আরম্ভ করে। এরপর আমেরিকা কর্তৃক পৃষ্য,

অপরিণামদর্শি এবং দুর্নীতিগ্রস্ত লোকদের সমন্বয়ে গটিত নতজানু সরকার সমূহকে দিয়ে নূতনভাবে আরও একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের অনুমোদন নিয়ে েয়া হয়। এসব প্রকল্পগুলোর একটি মাত্র উদ্দেশ্য আর সেটি হচ্ছে, উন্নয়নশীল বিশ্বের সম্পদ হরন করা। এটা কি করে সম্ভব হতে পারে যে, গতকালের ডাকাত আজ বিচারকের চেয়ারে বসে বিলিয়ন ডলার মূল্যের ন্যায়নীতির উপদেশ দিবে? এই সত্যটুকু অনুন্নত বিশ্বের নতজানু সরকারগুলো আমলে নিতে চায় না।

এটা সত্য যে, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ব্যতিরেকে অনুন্নত দেশগুলোতে ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ ও দারিদ্র নির্মূল করে উন্নয়নের সোনার হরিণকে ধরা অনেকটা অসম্ভব। জাতিসংঘ কর্তৃক প্রনীত মিলেনিয়াম গোলের প্রথম উদ্দেশ্যও ছিল অনুন্নত দেশ সমূহ থেকে দারিদ্র উচ্ছেদ করা। তবে একমাত্র রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই দারিদ্র নির্মূল সম্ভব এই সহজ কথাটি উন্নয়নশীল বিশ্বের করিৎকর্মাদের মনে রাখা উচিত। সমসাময়িক বিশ্বে উন্নত দেশগুলোর ইতিহাস এই ধারণাটির সত্যতা অনুমোদন করে। নৈতিক ও মানসিকভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত বা সম্পদ হরনের নেশায় দুর্নীতিতে নিমজ্জিত বা †দশ প্রেম বিবর্জিত লোকদের দ্বারা গঠিত অগণতান্ত্রিক সরকারগুলো পৃথিবীর কোথাও দুর্নীতি ও দারিদ্র উচ্ছেদ করতে পেরেছে এমন কোন তথ্য-উপাত্ত রাষ্ট্র বিজ্ঞান বা সমাজ বিজ্ঞানের কোথাও লিখা নেই। এসব অগণতান্ত্রিক সরকারগুলো নূতনভাবে দুর্নীতি ও সন্ত্রাসকে চাষ করে থাকে এবং দিনের শেষে প্রতিক্রিয়াশীল পরিচিতি নিয়ে এসব সরকারের পতন হয়। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের আর্শীবাদে এসব তাবেদার সরকারগুলোর জঘন্যতম মানবাধিকার লংঘনের ইতিহাস চাপা পড়ে থাকে।

সকল প্রকার অনিয়ম, সীমাহীন অত্যাচার, অবিচার ও লুণ্ঠনকে নিরাপদ করতে রাজনীতিকে সমাজ ও দেশ থেকে এবং বিশেষ করে উন্নয়নশীল বিশ্ব থেকে উৎখাত করে শুক্র, মঙ্গল বা অন্য কোন গ্রহে নির্বাসনে পাঠিয়ে পশ্চিমা মাতব্বরদের পাশাপাশি অনুন্নত বিশ্বের তু ষামোদকারী বুদ্ধিজীবীরা পর্যন্ত মনে হয় যেন স্বস্তি-নিঃশ্বাস ফেলতে চায়। এই অরাজনৈতিকা য়‡নর আওতায় উন্নয়নশীল বিশ্বের †ছাট বড় সব ক'টি দেশকে পর্যায়ক্রমে নিয়ে আসার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল তাদের কুট-কৌশল অব্যাহত রেখেছে।

বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ তাদের বেনিফিশারী, আমেরিকার আধিপত্যকে চিরস্থায়ী করার লক্ষ্যে উন্নয়নশীল বিশ্বকে অরাজনৈতি কায়নের প্রকল্প বাস্তবায়নে মরিয়া হয়ে কাজ করছে।আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থাগুলো উন্নয়নশীল দেশের রাজনৈতিক দলগুলোকে গণমানুষের দাবী দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করা থেকে বিরত থাকতে বা জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়ার প্রতি সমর্থন দেয়া থেকে বিরত থাকার চাপ অব্যাহত রেখেছে। নিউলিবারেলিজমের রাবনরা উন্নয়নশীল বিশ্বের জনগণকে রাজনৈতিক মত পার্থক্য ভুলে গিয়ে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ব্যবস্থাপত্রানুযায়ী উন্নয়নের জোয়ারে সাঁতার কাটার জন্য রাষ্ট্র ও নিজেদের শরীরকে বিবস্ত্র করে নৃত্য করতে আজ্ঞপ্তি দিয়ে চলেছে। আর এসব অপকর্ম চালানো হচ্ছে বর্তমান বিশ্বায়নে আমেরিকার নেতৃত্বকে আন-চ্যালেঞ্জড এবং টেকসই করার স্বার্থে। ১৯৯৭ সালে Robert Kegain ও William Kristol সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত প্রজেক্ট ফর দি নিউ আমেরিকান সেনচুরির (Project for the New American Century) প্রস্তাবনুযায়ী আমেরিকার নেতৃত্বের খড়গকে বিশ্বব্যাপী জগদ্দল পাথরের ন্যায় বসিয়ে রাখতে এবং সে লক্ষ্যে আমেরিকার সামরিক শক্তিকে আরও ভয়াবহ আকারে বৃদ্ধি করতে মার্কিন প্রশাসন মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে চলেছে (সূত্রঃ www.newamericancentury.org/)।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অতীত ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ১৬৬০-১৭১৪ এবং ১৮৬০-১৯১৪ যথাক্রমে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড ত কালীন মহাশক্তিধর দেশ হিসেবে গোটা বিশ্বকে তাদের এক ক শক্তিবলয়ে মধ্যে রেখে এক কেন্দ্রিক বি শ্বব্যবস্হা প্রতিষ্টিত করেছিল (Unipolar World Order)।যাহা আজকের পৃথিবীতে আমেরিকার বি শ্বব্যাপি একক দৌরাত্বের সমা ন(American Unipolar hegemony)।ফ্রান্স বা বৃটিশ যুক্তরাজ্যের বিশ্বব্যাপি এক ক দৌরাত্ব অতীতে ও চিরস্হায়ী হয়নি। আর্ন্তজাতিক সম্পর্কের নথি অনুযায়ী কোন কালে কোন মহাশক্তির ই বিশ্বব্যাপি একক দৌরাত্ব চিরস্হায়ী হয়নি আর আজ ও হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আমেরিকার মাথা ব্যথার কারন এখানে ই। আমেরিকা তার একক পরাশক্তি অবস্হানকে চিরস্হায়ী করে রাখতে চায়। একক বিশ্ব নেতৃত্ব থেকে ছিটকে পড়ার ঐতিহাসিক ঘটনাবলী পর্যালোচনা করে নিউরিয়েলিস্ট (Neorealist) থিওরির ভিত্তিতে নেয়া হাইপোথেসি সের মতে, এককেন্দ্রিক বিশ্বশক্তি ব্যবস্হা(Unipolar World Order) ক্ষনস্হায়ী হতে বাধ্য। তথা বিশ্বব্যাপী একক আধিপত্য ও দৌরাত্ত ছোট বা বড় অন্নান্য সকল দেশের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠার কারনে বিশ্ব রাজনীতিতে বহুশক্তির সম্মিলিত বিশ্ব ব্যবস্থাকে (মালটিপুলার ওয়ার্ড ওয়াডার ) বিশ্বের জনগন উৎসাহিত করে এমন ধারনাকে শক্তভাবে সমর্থন করে (The historical evidences from 1660-1714 and 1860-1914 strongly support the hypothesis derived from reorealist theory : Uniplar moments cause geopalitical backlashes that lead to multipolarity (সূত্র ঃ Layne,Christopher: the Unipolar lllusion, International Security, vol.17,1993, P.32)।

বিশ্বে একক আধিপত্য বিস্তার এবং মহাশক্তিধর রাষ্ট্র সমূহের উত্থান-পতনের ইতিহাসের আলোকে একবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার একক বিশ্ব শাসন ব্যবস্থাকে সংকটমুক্ত ও চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্য নিয়ে মার্কিনী যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন বিশ্বব্যাপী শোষন অব্যাহত রেখেছে । আর এ লক্ষ্যে আমেরিকা বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের মাধ্যমে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলো র আর্থসামাজিক অবস্থা ধ্বংস করে দিয়ে আমেরিকার বিরোধী শিবিরে র পা ল্লা যাতে ভারী না হতে পারে এবং গরীব মানুষগুলো নিজেদের পায়ে দাঁ ড়িয়ে আমেরিকার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার সম্ভাবনাকে চিরতরে বন্ধ করে দিতে চায় । এই শোষন প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখার নিমিত্তে আমেরিকা উন্নয়নশীল বিশ্বে গণতন্ত্রের প্রসার ও গরীবদের ভোটের অধিকারকে ভয় পায় এবং এজন্য লাগাম ধরে বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র প্রসারের চাকা বিকল করে রাখতে ত । সমসমায়িক বিশ্বায়নে নিজেদের একক কর্তৃত্ব ও লুণ্ঠনকে স্থায়ী করার জঘন্যতম উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন বিশ্বব্যাপী এক ভয়াবহ নৈরাজ্যেকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রেখেছে । গনতগ্রের তা নিউ-লিবারেল মতবাদের ধুরন্দর পন্ডিতরা তাদের নিজেদের স্বার্থে তথা গোটা বিশ্বের সম্পদ কে কুক্ষিগত করার স্বার্থে ব্যবহার করতে বদ্ধপরিকর। আর সে জন্য তাদের প্রয়োজনে যত্রতত্র বল প্রয়োগ করতে দিদ্ধাবোধ করেনা। ভিয়েতনামের হোচি মীন, চিলির আলেন্দে বা ইরাকের সাদ্দাম হুসেন কেউ আমেরিকা বা বিশ্বব্যাংকের রিরুদ্ধে যোদ্ধ করতে যায়নি। অন্য দেশ দখল করার ঘৃন্য খায়েশ যুদ্ধবাজ আমেরিকার বিগত শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে পোষন করে আসছে।

কে,আশুক রাও, নিউ-লিবারেল আক্রমন পর্যবেক্ষন করে বলেন, যেখানে তিনজন লোকের সঞ্চিত সম্পদ,একত্রে ৪৮ টি দেশের জি. ডি. পি. কে অতিক্রম করে, গোটা মানব জাতির মধ্যকার সবচেয়ে ধনী এবং দরিদ্রতম মানুষের অনুপাতিক হার ক্রমান্বয়ে খারাপের দিকে ধাবিত হয়, যথা ১৯৬০ সালে ৩০:১ থেকে ১৯৯০ সালে ৬০:১ বর্ধিত হয় এবং ১৯৯৭ তে ৭৪ গিয়ে দ াঁড়ায় সেখানে মান ুষের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তারকারী অর্থনৈতিক সঙ্কষ্টিকে পাশ কাটিয়ে গনতন্ত্রের কথা বলা ভাল বিবেচনায় একটি উদ্দেশ্য পণোদিত আদর্শ এবং মন্দ বিবেচনায় আরাম চেয়ারে বসা পেশাদার বুদ্ধিজীবিদের উপভোগ বলাযেতে পারে।এক ই প্রবন্ধে তিনি আরও বলেন, গনতন্ত্র পদটিকে নিজেদের স্বার্থে অন্যখাতে ব্যবহার করা এবং বিশ্বায়নের বিকল্প

বিষয়ে পরিনত করা রাজনৈতিক ফ্রন্টে নিউলিবারেল বিশ্বায়নের আক্রমন বই আর কিছু নয়; ("When the Wealth of three persons excceds the combined Gross Domestic Product (GDP) of 48 nations and the ratio of the richest and poorest fifth of humanity steadly deteriorates from 30:1 in 1960 to 60:1 in 1990 and 74: in 1997 then any talk about democracy devoid of the economic content that affects the lives of the people is at best motivated ideology and at worst, shadow boxing indulged in by armchair professional intellectuals"). In the same article he wrote further, "Therefore to manipulate the term democracy and make it an alternative to globalizsation is a part of neo-liberal offensive on the political front") (সুত্র: Rao, K Ashok, "Eroding the Ability of the Southern Nation-states to Safeguard their People,s Interest", in Democracy and Globalization: Promoting a North-South Dialogue, Edited by Leena Rikkila and Katarina Sehm patomaki, Helsinki, 2001, p.40-54, For more information, see www.nigd.u-net.com)

আমেরিকার শোষন ও লুন্ঠন দুনিয়ার সব মানুষ মেনে নিয়েছে এমনটি ভাবার কোন কারন নাই। আমেরিকার শোষন, লুন্ঠন ও বিশ্বকে অরাজনৈতিককরণের প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সামাজিক আন্দোলনও অব্যাহত রয়েছে। ভেনিজুয়েলা ও বলিভিয়ার ন্যায় ছোট দেশ ও রাজনৈতিক চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে আমেরিকার চক্রান্তকে নস্যাৎ করে দিতে সক্ষম হয়েছে। এসব ক্ষুদ্র দেশগুলোর জনবলে বা সামরিক শক্তি আমেরিকার তুলনায় হাস্যকর হলেও রাজনৈতিক চেতনায় সমৃদ্ধ রাষ্ট্রযন্ত্র ও জনগণের সম্মিলিত বাধার মুখে আমেরিকায় ন্যায় বিশ্বের একক শক্তিধর রাষ্ট্রকে ও পরাজয় বরন করে নিতে হয়েছে। মার্কিনি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আজ বিশ্বব্যাপি আন্দোলন চলছে এবং আরও ব্যাপক আকারে সংঘটিত হচ্ছে। অরাজনৈতি কায়ন নয় বরং রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ একটি জনগোষ্ঠীই কেবল ছোট বড় সবদেশে উন্নয়ন ও সংস্কারে অর্থপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। উন্নয়নশীল বিশ্বের গরিব দেশগুলোতে শুধু নয় বরং আমেরিকার একক আধিপত্যকে বিশ্বব্যাপী স্থায়ীকরণের গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে পৃথিবীর সর্বত্র এই অরাজনৈতিককরনের প্রক্রিয়া সক্রিয় রাখা হয়েছে। নিউলিরেল বিশ্বায়নের চাপে মূলতঃ ইউরোপ আমেরিকাসহ সব ক'টি সংসদ অন্তঃসার শূন্য হয়ে পড়েছে। বৃটিশ সামাজ্যের সংসদ যাহা কিনা বিশ্বের জের ও সকল সংসদের মা হিসেবে পরিচিত, সেখানে একজন সাংসদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সেই অর্থে আয় অবশিষ্ট নেই। সেই ক্ষমতা থাকলে টনি বেয়ারের পক্ষে ইরাক দখল করে নেয়া সম্ভব হত না। আজকের একজন বৃটিশ এমপিও বেঞ্চে বসেন, খুব কম কথা বলেন, তার ক্রিয়া কলাপও সীমিত। শুদ্ধ ভাষায় থাকে ক্ষমতাহীন। বলা যেতে পারে বৃটিশ পার্লামেন্টেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের রূপ রেখা ও কৌশল অদৃশ্য কোন এক স্থান থেকে আসে।

একক পরাশক্তি আমেরিকার বিশ্ব পুলিশের ভূমিকাকে চিরস্থায়ী করার লক্ষ্যে গোটা বিশ্বের জনগোষ্ঠীকে অরাজনৈতিককরনের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। স্থান, কাল, পাত্র ভেদে কেবল কৌশলটা পরিবর্তন করা যায়। পশ্চিমা বিশ্বের দেশগুলোর জনগণকে রাজনীতি বিমুখ করে তুলতে আবার এক ভিন্ন ধরনের কৌশলের প্রয়োগ চলছে। পশ্চিমের দেশগুলোয় এক উলেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ গত ২/৩ বা চার জেনারেশন থেকে বেকার ভাতার উপর নির্ভর করে কোনভাবে বেঁচে আছে। এদের পাশাপাশি এক বিরাট সংখ্যক মানুষ †ছাঠা কামলা হিসেবে শ্রম বিক্রি করে (যাদের কোন স্থায়ী চাকুরি নেই এবং যে কাজ পায় সেটা করে থাকে) এই অস্থায়ী কর্মজীবিদের আবার বেতন এবং ভাতা ও অনেক কম। এসব পরিবারগুলো বেঁচে থাকার স্বার্থে সময় সময় ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে নিজেরাই নিজেদেরকে ভুতুর্কি দিয়ে থাকে। এই মানুষগুলো বাঁচার চেষ্টা করতে করতে এক পর্যায়ে যখন ব্যাংকের ঋন শোধ করতে পারে না তখন পরিবার পরিজন ভেঙ্গে যায়। মাদকদ্রব্য সেবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত পালিয়ে বেড়াতে

বেড়াতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এসবের সাথে আবার আছে মধ্যবিত্ত যুব সমাজ যারা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চিন্তায় বিভোর হয়ে এ থেকে সহজে পরিত্রান পেতে মাদক ও যৌন উপভোগকে জীবনের লক্ষ্য ধরে নিয়ে এসবের মধ্য ডুবে থেকে স্বস্তি পেতে চায় এবং পর্যায়ক্রমে নিশ্বেষ হয়ে যায়।

পাশ্চাত্য বিশ্বের এসব বেকার, প্রান্তিক উপার্জনক্ষম মানুষ এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চিন্তায় দিশেহারা যুবকদের অতি কৌশলে বিদেশী আবাসনকারী এবং অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে লাগিয়ে রাখা হয়েছে। এই শ্রেণীর লোকদের রোষ যাতে সামাজিক আন্দোলনকারীদের বা রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ কর্মী বাহিনীর কাছে না পৌঁছে সেজন্য ভিন্ন ভিন্ন ফন্দি-ফিকির হিসেবে বিশ্বের মানুষকে শ্রেণী চেতনার বাইরে রেখে বিশ্বব্যাপী শোষন অব্যাহত রাখার প্রক্রিয়ায় আমেরিকা ধর্মীয় উন্মাদনাকে লালন করে ক্লাশ অফ সিভিলাইজেশনের ধারায় বিশ্বকে বিভক্ত করে রেখেছে। মার্কিন যুক্তরাস্ট্র প্রশাসন দখলদারী ও বিশ্বব্যাপী নিজেদের আধিপত্যকে চিরস্থায়ী করতে ধর্মান্ধতা ও জাতিগত বিবাদকে সর্বত্র উস্কানি দিয়ে হাজার বছরের অর্জিত সভ্যতাকে ধ্বংসে লিপ্ত। ধর্মের মধ্যেকার হালাহালির অগ্নিকান্ডের লিলি শিখাকে আরও বেগবান করতে আমেরিকা ধর্মীয় চরমপন্থীদের লালন ও সহযোগিতা দিয়ে চলেছে। অন্যদিকে, সময় সময় নিজেদের সৃষ্ট ধর্মীয় চরমপন্থীদের শায়েস্তার নামে আমেরিকা প্রহসনমুলক নাটকের মহড়া দিয়ে থাকে। আজকের পৃথিবীতে এক ইঞ্চি স্থানও পাওয়া যাবে না। যেখানে আমেরিকার উপস্থিতি নেই। এমনকি পৃথিবীর বাইরে আকাশ মন্ডলের সকল শূন্য স্থান ও আমেরিকার দখলে নিয়ে আসা হয়েছে। সহযোগী বন্ধু রাষ্ট্রবর্গ, পদলেহি তাবেদার গোষ্ঠী নানা রকমের গোয়েন্দা সংস্থা ছাড়াও আমেরিকা আজকের দিনের উন্নত প্রযুক্তিকে মানবকল্যাণে ব্যবহারের পরিবর্তে মানুষকে ধ্বংসের নিমিত্তে বিশ্বব্যাপী ব্যবহার করে চলেছে। ভুলে যাবার কোন অবকাশ নেই যে, একমাত্র আমেরিকাই আনবিক বোমা নিক্ষেপ করেছিল এবং ইচ্ছা করলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট যত্রতত্র যখন তখন আনবিক ব্যবহার করতে পারেন এবং এই ভয় অব্যাহত রয়েছে। আনবিক অস্ত্র ব্যবহার করে মানবজাতি ও সভ্যতাকে ধ্বংস করার অসৎ উদ্দেশ্যে আমেরিকা দীর্ঘ চার যুগ সময়েও 'আনবিক অস্ত্র প্রথমে ব্যবহার করব না' (No first use) এই আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষর না করে মুলতঃ বিশ্ববাসীকে হুমকির মধ্যে রেখেছে। এই পরিস্থিতি প্রকৃত অর্থে বিশ্ব মানবের বিরুদ্ধে আমেরিকার ঘোষিত সাইকোলজিকেল যুদ্ধের নামান্তর। এই যুদ্ধবস্থাকে অব্যাহত রাখার স্বার্থে আমেরিকা একের পর এক পাতানো শত্রু আবিষ্কার করে। যে কারনে সাম্প্রতিক কালের আক্রমণ এবং ধর্মীয় উগ্রবাদ নিয়েও অমীমাংসিত অনেক প্রশ্ন রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট G.W. Bush জুনিয়র সাহেবের লীলা খেলার একটি উদাহরণ চাপিয়ে রাখতে পারলাম না। জনাব বুশের দ্বিতীয় দফা নির্বাচনী দিনের ২/৩ দিন পূর্বে হঠাৎ করে আল-কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেন এক ভিডিও টেপের মাধ্যমে আমেরিকায় বসবাসরত বিদেশীদের জনাব বুশকে ভোট না দেয়ার অনুরোধ জানালেন। নিরাপত্তাহীনতার আক্রান্ত সাধারণ আমেরিকানরা দ্রুত গতিতে জনাব বুশকে নিরাপত্তার প্রতীক হিসেবে পুনর্বিবেচনা করতে আরম্ভ করলেন। এর ফলে পিছনে থাকা জনাব বুশ হঠাৎ করে প্রচুর সমর্থন নিয়ে জন কেরীকে পিছনে ফেলে সামনে এসে গেলেন এবং কোর্টের রায়ে জবরদস্তিমূলক প্রেসিডেন্ট হওয়ার ইতিহাসের উপর প্রসাধনী এটে দ্বিতীয়বার জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। একই প্রক্রিয়ায় যখন আমেরিকা অন্যদেশের বিরুদ্ধে আক্রমন অব্যাহত রাখতে চায় বা মধ্যপ্রাচ্য সমন্ধীয় কোন গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণ করার প্রাক্কালে বা আমেরিকায় অবস্থানরত আবাসনকারী সমন্ধে সংকোচনমূলক নীতি গ্রহণ করার সময় মাঝে মধ্যে ওসামা বিন লাদেলকে প্রচার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। পৃথিবীর নিরপেক্ষ জনগোষ্ঠী এসব প্রচারকে

আমেরিকাবাসীদের ভয়-ভীতির মধ্যে রেখে হোয়াইট হাউস কর্তৃপক্ষের মানবকল্যাণের বিরুদ্ধে বিতর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অপকৌশল হিসেবে দেখে থাকেন।

এ প্রসঙ্গে ভারতের দি এশিয়ান এজ এবং দৈনিক ডেকান ক্রনিকলের (The Asian age and the Daily Deccan Cronicle)-চীফ এডিটর জনাব এম.জে আকবরের মন্তব্য খুবই চমৎকার। জনাব আকবর জানতে চান যে, আল-কায়েদা সম্পর্কিত এসব টেপ আল-জাজিরা টেলিভিশনে আলাদীনের উড়ন্ত কার্পেটে চড়ে পৌঁছে কি-না? তিনি আরও বলেন, যে ইন্টারনেট পৃষ্টায় এসব নুতন টেপ প্রচার হয়ে থাকে, এসব ইন্টারনেট পৃষ্ঠা কি কোন সারভার ছাড়া চলে? এবং এসব সারভার কি চিহ্নিত করা যায় না? তিনি মনে করেন এসব অনেক প্রশ্নের যথেষ্ট উত্তর নাই (সূত্রঃ www.newsweek.washingtonpost.com/postglobal/mj_akbar/2007/09/adversaries_will_captalize_on.html)।

ওদিকে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোতে তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, টেকনোক্রেট এবং মিলিটারী দিয়ে শাসন কার্য পরিচালনা করানো একটি অতিপরিচিত কৌশল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায় সবক'টি উন্নয়নশীল দেশের পরোক্ষ সরকার বললেও ভুল বলা হবে না। আমেরিকার তথাকথিত নিরাপত্তা বলয়ের দেশগুলোতে কেবলমাত্র সি.আই.এ'র আশীর্বাদপুষ্ট দল, সামরিক-বেসামরিক আমলা ও ভুইফোড় সিভিল সোসাইটির †লাকদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় নিয়ে লোটপাঠের সুযোগ দেয়া হয়ে থাকে। ঐসব তাবেদার সরকারগুলো একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফরমায়েশ রক্ষা করতে নিবেদিত ভূমিকা রাখে এবং অন্যদিকে আমেরিকার ছত্রচ্ছায়ায় দুর্নীতির মাধ্যমে নিজেদের আখের গোছাতে ব্যাস্ত থাকে। বাংলাদেশের ন্যায় দুর্ণিতি পরায়ন দেশ সমূহে শুধুমাত্র পরগাছা রাজনীতিক, মন্ত্রী, সাংসদ বা ব্যবসায়ীরা দুর্ণিতিগ্রস্হ নয়। সকল পর্যায়ের সামরিক-বেসামরিক আমলা ঘুষ, দুর্নীতি, অনিয়ম এবং আইন বহির্ভূত কার্যকলাপ ইত্যাদির সাথে কমবেশী জড়িত। কার্যত: সব দুর্নীতি বাজরা একত্রিত হয়ে গোটা প্রশাষণযন্ত্রকে অকেজ করে রেখেছে। এরা একদিকে নিজেদের প্রয়োজনে সমাজে সন্ত্রাস লালন করে এবং অন্যদিকে নিও-লিবারেল বিশ্বায়নের পক্ষ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সকল প্রকার দুর্ণিতির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। অনুন্নত বিশ্বের শাষকশ্রেণী মুলত: আমেরিকার আশ্রিত পরগাছা কীট-পতঙ্গ বই আর কিছু নয়। যে কারনে এই সব তাবেদার গোষ্টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের ন্যায় জনগণের প্রকৃত রাজনৈতিক চেতনাকে ভয় পায়।

উন্নয়নশীল বিশ্বের এই তাবেদার শাষক †গাষ্ঠী ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, সন্ত্রাস ও দুর্ণিতির যাতাকলে দেশ শাষন করতে গিয়ে সহসা ই জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তারপর এই গণবিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসীরা আমেরিকার ছত্রচ্ছায়ায় এক বিকৃত ধরনের ভোট ব্যবস্থায় দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত টাকা ও পেশীশক্তি ব্যবহার করে তথাকথিত গণতান্ত্রিক আবরণ এটে দিয়ে আকাম-কুকাম চালিয়ে যায়। দেশের জনগন বা দেশীয় সম্পদের প্রতি এদের শ্রদ্ধা ও সআনুভূতি চিরতরে লোপ পায়। আমেরিকার নির্দেশে এবং প্রশাষনের ছত্রছায়ায় এ সব শাষক-এলিটরা নিজ নিজ দেশের সম্পদ তথা তেল, গ্যাস, বিদ্যু সহ সকল প্রাকৃতিক সম্পদ, কৃষিখাত এবং শিল্প কারখানা সহ গরীব জনগোষ্টির জীবিকার সকল উ . রেল, বিমান, বিমানবন্দর,সমূদ্রবন্দর সহ রাষ্টীয় সকল জরুরি প্রতিষ্ঠান সমূহ ও শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সেবামূলক খাতসহ সবকিছু নিউলিবারেল ব্যবস্থাপত্রানুযায়ী লুন্ঠনের জন্য বিদেশীদের কাছে উন্মুক্ত করে দিয়ে নিজেদের কে স্বার্থক প্রশাষণের অংশিদার ভাবে।

নর্দমা থেকে উঠে আসা ঐসব শাসক শ্রেণী প্রশাসন যন্ত্র ও সন্ত্রাসকে একাকার করে দেয় এবং বিরতিহীনভাবে লুটপাট চালাতে থাকে। লুটপাট করে অর্জিত অর্থ সম্পদ এরা নিজ নিজ দেশের ব্যাংকে জমা রাখতে বা নিজ দেশের উন্নয়নের নিমিত্তে বিনিয়োগ করতে অনীহা প্রকাশ করে অথবা ভয় পায়। তারা নামে-বেনামে বিদেশী ব্যাংকে চুরি করা অর্থ জমা করে রাখে এবং পশ্চাত্যের কোন উন্নত দেশে বা ডি- ফেক্টো কোন উন্নত দেশে লুটপাটের অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে।

এসব অত্যাচার, অবিচার, লুটপাট ও অরাজকতা এক পর্যায়ে সহ্যের সীমা অতিক্রম করে এবং জনগনের কাছে বিষফোড়া হয়ে দেখা দেয়। নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে মানুষের বাঁচার আকাংখা শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ আন্দোলনে রুপ নেয়। কৃষক-শ্রমিকসহ সাধারণ মানুষগুলো নিজেদের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করতে সংঘটিত হতে আরম্ভ করে। কিন্তু গরীব মানুষের ভোটের ক্ষমতাকে আমেরিকা ও বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তাবেদার গোষ্ঠী যমের ন্যায় ভয় পায়। আমেরিকার ও তার দোসরগণ আবারও কিছুটা প্রসাধনিক পরিবর্তনের প্রলেপ এটে দিয়ে ভোট জালিয়াতি মাধ্যমে, সামরিক শাষণ বা অন্য কোনভাবে তথাকথিত কিছু সংখ্যক মহারতিকে ক্ষমতায় নিয়ে আসে। বিগত শতাব্দীর প্রথম দিকে আমেরিকা বিশ্বরাজ্য নীতিতে একটি শক্তিশালী নিয়ামক শক্তিতে আবির্ভুত হবার পর থেকে অদ্যাবধি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই ন্যাক্কারজনক কাজটি করে অবিরতভাবে আসছে। বিগত শত বৎসরের ইতিহাস প্রমাণ করে যে, আমেরিকা পৃথিবীর সর্বত্র টাকা, অস্ত্র ও কুটনৈতিক সহযোগিতা দিয়ে, জাতি, গোষ্ঠী, বর্ণ ও ধর্মীয় অনুভূতির ব্যবধানকে আভ্যন্তরীণ যুদ্ধে রূপান্তরিত করে বহুদেশের আর্থসামাজিক পরিকাঠামো ধ্বংস করে দিয়েছে।

আজকের এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অনুন্নত বিশ্বের দেশগুলোর অবশিষ্ট আর্থ সামাজিক কাঠামোকে চিরতরে ধ্বংস করে দেয়ার সূচনা পর্ব বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের বুদ্ধগোষ্ঠী করে থাকে বা তাদের দিয়ে করানো হয়। এই নুতন থিংক টেংক, আমেরিকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং অবশ্যই তাহারা আমেরিকার শোষন-লুণ্ঠনকে অব্যাহত রাখতে নিয়োজিত রয়েছে। কোথাও আমেরিকার স্বার্থে যথাযথভাবে সংরক্ষিত হচ্ছে না এমনটির সম্ভাবনা দেখা দিলে একক পরাশক্তি নরম শক্তির পরিবর্তে কঠিন শক্তি (যুদ্ধ-বিগ্রহ) প্রয়োগ করে যেকোন দেশ দখল করে নিয়ে শায়েস্তা করে। স্নায়ুযুদ্ধত্তর আমেরিকার প্রশাসন উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোকে তার অঙ্গরাজ্য বিবেচনা করে সর্বত্র প্রশাসনিক উপস্থিতি বিদ্যমান রেখেছে। আর এসব করা হচ্ছে তাদের ভাষায় গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষা করার জন্য।

গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের নামে এসব অপকর্ম করতে গিয়ে আমেরিকা গোটা পৃথিবীর মানবগোষ্ঠীর সাংঘাতিক দুটি ক্ষতি করছে। প্রথমতঃ কেবল গণতন্ত্রই মানুষকে সকল প্রকার কু-সংস্কার ও নিপীড়ন থেকে মুক্তি দিয়ে মানুষের জ্ঞান ভান্ডারকে বিকশিত করতে পারে এই সত্যটিকে প্রশ্নের সম্মুখীন করছে। আর দ্বিতীয়তঃ দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর বিভিন্ন ধর্মের মধ্যকার হানাহানি ও যুদ্ধ বিগ্রহের পর জাতীয় রাষ্ট্র সৃষ্টির মাধ্যমে এবং আধুনিক রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বলিয়ান হয়ে পৃথিবীকে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য নির্ভয়ে বসবাসের স্থান বিবেচনাটি প্রতিষ্ঠা পায়। এরই ধারবাহিকতায় গোটা ভূমন্ডলের সবকিছুকে মানবকল্যাণে ব্যবহার করার প্রয়াস নিয়ে গোটা বিশ্বের সৃজনশীল মানবগোষ্ঠী যখন অগ্রসর হচ্ছিল ঠিক তখনই আমেরিকা ক্লাশ অব সিভিলাইজেশন গোছের যুক্তি ও উস্কানি দিয়ে ধর্মীয় উন্মাদনাকে পরিপুষ্ট করে গোটা মানব সমাজকে আবার সেই অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

আমেরিকার এ ধরনের প্রয়াসকে আন্তর্জাতিক পুরস্কার বিজয়ী খ্যাতনামা ওয়ার রিপোর্টার John Pilge 'দি ওয়ার অন ডেমক্রেসি 'নামের প্রামান্য ছবিতে তুলে ধরেছেন এবং এর সংজ্ঞায় বলে ছেন, যে গণতন্ত্র পাশ্চাত্যের ব্যবসা য়ী এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আসে, এ ধরনের গণতন্ত্র প্রকৃত গণতন্ত্রের (Popular Democracy) বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং প্রপাগান্ডা হিসাবে কাজ করে (সূত্রঃ www.venezuelanalysis.com/analysis/2363; / www.warondemoecracy.net)। মরণাস্ত্রে অদ্বিতীয় আমেরিকা প্রকৃত অর্থে বা অনুমানের উপর নির্ভর করে অথবা কৃত্রিম শত্রু চিহ্নিত করে যুদ্ধ প্ররোচনায় লিপ্ত থাকা মিলিটারী প্রযুক্তির বিকাশের জন্য অপরিহার্য্য মনে করে। আর তাই কৌশলকে আঁকড়ে ধরে একের পর এক শত্রু আবিষ্কার করে সর্বত্র খবরদারি করতে সচেষ্ট রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার বদলের (Regime change) ব্যবসা অব্যাহত রেখেছে এবং বিনা উস্কানিতে বিভিন্ন দেশে আক্রমণ করে অনেক দেশের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে দিয়েছে। যুদ্ধ নেশায় মত্ত আমেরিকা স্বভাবগত কারনে ইরাকের পর উন্নয়নশীল বিশ্বের অন্য যে কোন দেশের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বিবেচনায় ভেনিজুয়েলা বা ইরানের উপর পরিবর্তীত মার্কিনী আক্রমণের সম্ভাবনা উঁড়িয়ে দেয়া যায় না।

আমেরিকার কৃত্রিম শত্রু আবিষ্কার এবং যুদ্ধ নেশায় মত্ত থাকার প্রবণতা চরমপন্থী পুরোহিত চক্রের অসুস্থ ষড়যন্ত্র আখ্যা দিয়ে বিশিষ্ট মিউজিশিয়ান Frank Zappa, CNN টেলিভিশনের Crossfire অনুষ্ঠানে বলেন, কুম্যনিজম আজ আমেরিকার প্রতি বৃহত্তম হুমকি নয়। হুমকিটা হচ্ছে এই যে, আমেরিকা একটি ফ্যাসিবাদী পুরোহিত তন্ত্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং এই সবকিছু প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগান থেকে আরম্ভ হয়েছে (সূত্রঃ www.CNN-Crossfire/FrankZappa/28.3.1986)। বিশ্বের অগণিত গণতন্ত্রকামী মানুষের আকাংখার প্রতি কুঠারাঘাত করে একক পরাশক্তি আমেরিকা বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিস্ট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে মরিয়া হয়ে কাজ করছে। শুধু মানুষ নয় সকল প্রকারের জীবজন্তু তথা প্রাণীকূল এমনকি ভূমন্ডলের আবহাওয়ার প্রতি ও আমেরিকা আজ হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা নিশ্চিত যে, আজকের বিশ্বে কেউ কোথাও নিরাপদ নয়। ২০০১ সালের ৯/১১ এর আগে আমেরিকার প্রভাবশালী থিংকটেংক (নিউ কনজারবেটিভ) তাদের দ্যা প্রজেক্ট ফর নিউ আমেরিকান সেঞ্চুরি (পিন্যাক) প্রজেক্টের গ্রহণযোগ্যতায় বলেছিলেন, আমাদের দরকার এমন বিপর্যয়কর এবং যুগান্তকারী ঘটনা, যা হবে পার্ল হারবারের মত। যা আমেরিকার জনমত কে যুদ্ধের পরে সংঘটিত করবে (সূত্র ঃ গ্রন্থনা-ফারুক ওয়াসিম, মুক্ত মঞ্চ,দৈনিক সমকাল, ঢাকা, ১১.৯.২০০৭)। বর্তমান প্রেসিডেন্ট G.W. Bush নিজেও এই নিউ কনজারবেটিভ ভাব ধারার একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব এবং এসব বুদ্ধারাই সাম্প্রতিককালে ফ্যাসিষ্ট-সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার ধারক ও বাহক।

যদিও Frank Zappa, প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগানের সময়কাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন-ফ্যাসিষ্ট পুরোহিত তন্ত্রের দ্বারা আক্রান্ত বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনে এই চক্রের প্রভাব ১৯৪০ দশকের শেষের দিক থেকে তথা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত্তোর কাল থেকে প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আমেরিকার উগ্র রক্ষনশীল বিদেশ নীতি মূলতঃ আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে পুরোহিত চক্রের প্রভাবের বর্হিপ্রকাশ। যদিও অনেক গবেষক এটাকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার এক উলেখযোগ্য সংখ্যক দেশ উপনিবেশী রাজত্বের শৃংখল ছিন্ন করে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠিতে পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলোর তুলনায় নব্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশসমূহ পশ্চাদপদ অবস্থানে ছিল। দু'একটি উদাহরণ ছাড়া এসব নব্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলোর রাজনৈতিক

প্রতিষ্ঠান সমূহ খুবই দুর্বল এবং বলতে গেলে ক্ষমতাহীন ছিল। এই দুর্বল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং অনুন্নত অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগে এইসব দেশে জাতি, গোষ্ঠী, ধর্মীয়, বর্ণ দাঙ্গা হাঙ্গামা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। ফলশ্রুতিতে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার পরিবর্তে স্বেচ্ছাচারী রাজা ও শেখদের পাশাপাশি মিলিঠারী শাসন, সীমাহীন দুর্নীতি এবং এক নায়কদের নির্যাতন-অত্যাচার সদ্য স্বাধীন দেশগুলোতে গণতন্ত্র বিকাশের সম্ভাবনাকে গোড়াতেই হত্যা করে ফেলে। ঐ অস্থিতিশীল পরিস্থিতির অভিশাপ থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলো আজও মুক্ত হতে পারেনি।

এই অসহনীয় অস্থিতিশীলতার কারন নির্ণয় ব্যতীত এর করালগ্রাস থেকে মুক্তি লাভের আশা করাও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। আর কারনটি হচ্ছে মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের অন্য দেশের লুন্টনের নেশা। একটু-আঠটু প্রসাধনিক পরিবর্তন করে এই ভয়াভহ সমস্যার সমাধান করা অ সম্ভব। প্রকৃত কারন চিহ্নিত করে এই দুরারুগ্য ব্যাধি কে উপড়ে ফেলার জন্য সঠিক ব্যাবস্হা নিতে হবে এবং তা হচ্ছে বিশ্বব্যাপি আমেরিকার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা। অর্থা আমেরিকার আগ্রাসী থাবাকে চিরতরে ভুতা করে দিয়ে গনতন্ত্রের পৃষ্টপোষক সেই পুরাতন আমেরিকাকে পুর্নআবিষ্কার করা। সাথে সাথে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে বিশ্বের সকল জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া খুব ই জরুরী। এই গুরো দায়ীত্বটি সঠিকভাবে পালন করতে পারলে ই †কবল উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অস্থিতিশীলতার অবসান হতে পারে। আর এই কাজটি করতে অরাজনৈতিককরণ নয় বরং রাজনীতি সচেতনতা ও ব্রড বেইজড রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি অপরিহার্য। হার্ভাড থিংক ঠেংক এবং আমেরিকার নিউ কনের (নিউ কনজারভেটিভ) প্রভাবশালী ব্যাক্তিত্ব অধ্যাপক Samuel Huntington, উন্নয়নশীল বিশ্বের অস্হিতিশীল রাজনীতির কারন চিহ্নিত করতে গিয়ে বলেন, দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন এবং ধীর গতিতে বিকাশমান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে সামঞ্জস্যহীনভাবে দ্রুতগতিতে জনগণের একটি নুতন গ্রুপের রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ '(It was in large part the product of rapid Social change and the rapid mobilization of new groups into politics coupled with the slow development of political institutions)। তিনি অনুন্নত বিশ্বের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার এবং রাজনৈতিক সমস্যার প্রাথমিক কারন হিসেবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের অনেক পিছনে পড়ে থাকা অবিকশিত রাজনৈতি প্রতিষ্ঠান সমূহকে চিহ্নিত করেন। যদিও অধ্যাপক হান্টিংটন এই বইটি অনেক দিন আগে লিখেছেন কিন্তু অনুন্নত বিশ্বের রাজনৈতিক শূন্যতাকে ব্যাখ্যা করতে তার গবেষণার মূল্য আজ অবধি প্রণিধানযোগ্য। Huntington মনে করেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত্তোর দুই দশকের আমেরিকার বিদেশ নীতি এই সমস্যাকে চিহ্নিত করতে ভুল করেছে। তিনির ধারনায় যদিও অনেক কর্মকর্তা মর্ডানাইজিং দেশগুলোতে একটি ভায়াবোল (Viable) রাজনৈতিক সরকারের প্রতিষ্ঠা আমেরিকার প্রাথমিক দায়িত্বের উপর বর্তায় এমনটি মনে করেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অনুন্নত দেশগুলোর রাজনৈতিক শূন্যতাকে আমলে না এনে অর্থনৈতিক শূন্যতার উপর জোর দিয়ে ধরে থাকে এবং সেই লক্ষ্যে গবেষণা ও কার্যক্রম চালাতে থাকে। Huntington এ পরিসরে আমেরিকার দৃষ্টি ভঙ্গির উপর মন্তব্য করতে গিয়ে এর ফাঁক-ফোকড়কে আশ্চর্য্যজনক আখ্যা দিয়ে ব্যাখ্যার অতীত বলে মন্তব্য করেন (সূত্রঃ Huntington P. Samuel, Political Order in Changing Societies, 1968, P.4-5 )।

অধ্যাপক হান্টিংটনের উপরোক্ত বইটি ১৯৬৮ সালে তার গবেষণার ফসল এবং সময়ের দিক থেকে তিনি স্বাভাবিক কারনে আমেরিকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত্তোর দুই দশকের বিদেশ নীতির উপর আলোকপাত করার পাশাপাশি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত্তোর কালের পৃথিবীর মানচিত্রে আবির্ভুত রাজনৈতিক স্বাধীনতাপ্রাপ্ত অনুন্নত দেশ

সমূহের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শূন্যতার কারন সমূহ চি ত্রিত করতে চেষ্টা করেছেন। তিনির এই গবেষণার পর অনেক দিন অতিবাহিত হয়েছে। পৃথিবীতে অনেক পরিবর্তন এসেছে। স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের মধ্যদিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক পরিবারের বিজয়ের জয়ধ্বনি বিশ্বের আনাচে-কানাচে দোলা দিয়েছে। এই বিজয়ের সবচেয়ে উলেখযোগ্য বিষয়টি হলো আমেরিকা র একক পরাশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজেদের খেয়াল খুশি মত এক কেন্দ্রীক বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে গণতন্ত্রের মুখোশ পরিয়ে বিশ্বের উপর চাপিয়ে দেয়া। স্নায়ুযুদ্ধ শেষ হয়েছে কিনা এ বিষয়ে সমাজ বিজ্ঞানী ও যুদ্ধ বিশারদদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। তবে স্নায়ু যুদ্ধ নিয়ে চুলচেরা বিশেষণ এই পরিসরে করার কোন অবকাশ নেই। স্নায়ুযু দ্ধোত্তর বিশ্বায়ন ব্যবস্থায় উন্নয়নশীল বিশ্ব বা অনুন্নত দেশগুলোর আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার উপর যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে সে বিষয়ে আলোকপাত করাই হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য। এবং এই আলোচনাকে এক মাত্র এক লাইনের মধ্য শেষ করা যায়। সন্দেহাতীতভাবে বলা যেতে পারে, না-স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ও পাশ্চাত্যের তথাকথিত গণতান্ত্রিক পরিবারের বিজয় উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য কোন সুফল বয়ে আনতে পারেনি। বরঞ্চ আমেরিকার একক বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া উন্নয়নশীল বিশ্বের দুর্ভোগ নাটকীয় হারে বাড়িয়ে দিয়েছে। একথাটি বিশ্বাস করার কোন কারন নেই যে, আমেরিকার অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে বা আমেরিকার বোদ্ধাগণের গবেষণাশালায় গবেষণালব্ধ প্রতিবেদনের অভাব রয়েছে। সামুয়েল হান্টিংটন নিজেই ১৯৬৮ সালে লিখিত বইয়ের পর ক্লাশ অব পিভিলাইজেশনের ন্যায় অনেক মূল্যবান কাজ আমেরিকাবাসীদের ও বিশ্ববাসীদের উপহার দিয়েছেন। এমনও নয় যে, আমেরিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বল্পতা রয়েছে। হার্ভাডসহ বিশ্বের প্রথম সা ির বিশ্ববিদ্যালয়ের বে শীর ভাগই আমেরিকা য় অবস্থিত। এর সাথে খ্যাতনামা গবেষকদের কাজ অহরহ বিভিন্ন জার্না লে এবং বই আকারে প্রকাশিত হচ্ছে। বিশ্বের সর্বত্র রাষ্ট্র ও সমাজ বিষয় ক গবেষণার কাজে প্রধানত আমেরিকান রাষ্ট্র বিজ্ঞানী ও সমাজ বিজ্ঞানীদের বই, জার্নাল এবং ইন্টারনেট সূত্র ইত্যাদি ডাটা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

গবেষণালব্ধ জ্ঞান ভান্ডারে সমৃদ্ধ আমেরিকার প্রশাসন তারপরও কিভাবে দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী বা আরও বেশি সময় থেকে একই ভুল বারবার করে আসছে এর উত্তর পাওয়া খুবই কঠিন। উন্নয়নশীল বিশ্বের রাজনৈতিক শূন্যতা ও স্থানীয় জনগণের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান এবং প্রজ্ঞাকে অবহেলা করে অর্থনৈতিক শূন্যতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে ছয় দশকের ও বেশী সময় ধরে এইড,ঋন,বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ, এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO), কনসরটিয়া মের পরিকল্পনাকারীগ নের এবং পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক গুরুদের সম্মিলিত কর্মকান্ড উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনে কোন রূপ অর্থবহ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি। পক্ষান্তরে আমেরিকার নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধায়নে এসব কর্মকান্ড অনুন্নত দেশগুলোর গোটা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ইনফ্রাসটাকচার ধ্বংস করে দিয়েছে। অধ্যাপক হা ন্টিংটনের পরও আরও অনেক গবেষণায় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি এসেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত থিংঙ্কঠেঙ্ক এইসব জ্ঞানকে আমলে না নিয়ে আজ অবধি অনুন্নত দেশগুলোতে সাহায্যের নামে জবরদস্তিমূলকভাবে নেতিবাচক কর্মকান্ড অব্যাহত রেখেছে। আমেরিকা গনতন্ত্র প্রতিষ্টার মিথ্যা অজুহাতে বিশ্বব্রমান্ডের উপর একচেটিয়া কতৃত্ব প্রতিষ্টার লক্ষ নিয়ে বিশ্বব্যাপি সকল প্রকার অপকর্ম সহ যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি অবাহত রেখেছে। বিশ্বব্যাপি গনতন্ত্র প্রতিষ্টার বিরুদ্ধে কাজ করতে গিয়ে মূলত: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রশাষন দীর্ঘদিন থেকে গনতান্ত্রিক মূল্যবোধকে অস্বীকার করে চলছে। আমেরিকার নিউ কনের কর্তারা দেদার ভূলে গিয়েছেন যে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধই হচ্ছে আমেরিকার রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ভিত্তি। গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতা আমেরিকার রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। গনতন্ত্র ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ব্যাতীত অপরিসীম সম্প দের অধিকারী হলেও আমেরিকার

গর্ব করার মত অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমৃদ্ধি আসা সম্ভব হত কিনা এবং আব্রাহাম লিংকন ও জর্জ ওয়াশিংটনের ন্যায় রাষ্ট্র নায়কদের মহান নেতৃত্বে রাজনীতি, সমাজ নীতিসহ সর্বত্র গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হলে আমেরিকার আজকের এই সুখী ইতিহাস লিখা সম্ভব ছিল কি-না, এই প্রশ্ন থেকে ই যায়।

বিশ্বশক্তিতে রুপান্তরিত হওয়ার পর থেকে আমেরিকা বিশ্বব্যাপি গনতন্ত্রের প্রসার ব্যাহত করছে! গণতন্ত্রের লেবাসে মোড়া আমেরিকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত্তোর কালের বিশ্ন মানচিত্রে আবির্ভুত স্বাধীন জাতি রাষ্ট্রগুলোসহ সকল উন্নয়নশীল দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসকে বাধাগ্রস্ত করে ষড়যন্ত্র চক্রান্ত ও যুদ্ধ বিগ্রহের সাথে জড়িয়ে পড়ল কেন? আমেরিকা এই সব অপকীর্তির সাথে না বুঝে জড়িয়ে পড়েছে, এমনটি বিশ্বাস করার কোন কারণ বা অবকাশ নেই। তাহলে কি বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বিশ্ব শক্তিতে পরিণত হওয়ার পর থেকে গণতন্ত্রের মুখোশের আড়ালে আমেরিকা এক গোপন মিশন নিয়ে কাজ করছে? সময়ের আবর্তনে পরাশক্তিতে এবং শেষমেষ একক পরাশক্তিতে পরিণত হওয়ার পরও আমেরিকার এই গণতন্ত্র বিরোধী কার্যকলাপ থামেনি বরং আক্রমণ সূচক প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় গণতন্ত্রের প্রসারকে আমেরিকা ভয় পায় আর প্রকৃত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক শক্তিই কেবল উন্নয়নশীল বিশ্বের রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে পারে। তাই গণতন্ত্রের প্রতি আমেরিকার নেতিবাচক ভূমিকা এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অস্থিতিশীল করে তুলার কারন খোঁজা খুবই প্রয়োজনীয়। এই কারন চিহ্নিত করা একটি দুরূহ ব্যাপার এবং আমেরিকার গণতন্ত্রের নীতি বিরোধী এসব কর্মকান্ডের কারন কোন একক গবেষণার উপর ভিত্তি করে চিহ্নিত করা কঠিন। কোন একক ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি বিশাল বিষয়ের উপর হাইপতেসি স প্রয়োগ করা কঠিন। তাই সঙ্গত কারনে বিগত দিনের কিছু ঘটনার উপর আলোকপাত করা প্রয়োজন।

প্রথমেই যে কারনটি আসে সেটা হচ্ছে, ১৯১৭ সালের রাশিয়ান বিপব। দুর্নীতিতে নিমজ্জিত রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে ভ.ই. লেনিনের নেতৃত্বে ভলসেভিক বিপবের সফলতা এবং সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার গোড়া পত্তন। বলসেভিক বি প্লব ভূমিকম্পের ন্যায় গোটা বিশ্বের শ্রমিক-কৃষক ও জনগণের বৃহত্তম অংশ তথা গরীব মানুষকে জাগিয়ে দেয়। শুধুমাত্র এলি ট‡দর সুখ-শান্তির নিমিত্তে নিয়োজিত অর্থনৈতিক নীতিমালার বিপরীতে বলসেভিক বিপব সমাজের মোটা অংশ তথা গরীব খেটে খাওয়া মানুষের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে এক নুতন ধরণের অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়নের অঙ্গীকার নিয়ে আসে। আমেরিকা এই নূতন অর্থনৈতিক নীতিমালার প্রসার ধনত্রেতর ব্যপ্তি বাধাগ্রস্ত হওয়ার বিপদে ভড়কে গিয়ে প্রথম থেকেই ভলসেভিক বিপবকে নস্যাত করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। এই ধারাবাহিকতায় ১৯১৮-১৯ সালে আমেরিকার নেতৃত্বে বৃটিশ, ফ্রান্স, জাপানী, পোলান্ড ইত্যাদি পাশ্চাত্যের দেশের সৈনিকরা রাশিয়ার মাটিতে ভলশেভিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে রাশিয়ানদের হত্যা করে। বিদেশের ভাড়াটিয়ে সৈন্য কর্তৃক রাশিয়ানদের হত্যাই মূলত বলাসেভিক বিপবকে সেই সময়ে সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্র বিজ্ঞানি Schuman, Frderick L মন্তব্যে বলেন, 'সোভিয়েত রা শিয়ার কম্যুনিষ্টরা পাশ্চাত্যের কোন দেশে সৈন্য পাঠিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি বরং আমেরিকার নেতৃত্বে পাশ্চাত্যের সৈন্যরা রাশিয়ার মাটিতে রাশিয়ানদের হত্যা করেছিল। আর এই বিদেশী কর্তৃক রাশিয়ানদের হত্যা করা বিদেশীদের কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণের বিয়োগান্তক ইতিহাসের আরেকটি নতুন অধ্যায় বিবেচনা করে সাধারণ রাশিয়ানরা বলসেভিকদের পতাকাতলে জড়িত হয়ে বিদেশীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং ফলশ্রুতিতে বলসেভিক বিপব প্রতিষ্ঠা পায়। পাশ্চাত্যের শক্তি সমূহের এই কুৎসিত আক্রমণ বলসেভিকদের বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত দেশপ্রেমিক হিসেবে চিহ্নিত করে।

পাশ্চাত্যের শক্তির কুৎসিত আক্রমণ তাই সম্ভবতঃ কম্যুনিষ্টদের ক্ষতির চেয়ে সাহায্য করেছিল'। (সূত্রঃ Schuman, Fredrick L., the Cold War; Retrospect and Prospect, Lousiana University Press,1962, P.79-80) সোভিয়েত রাশিয়ার কাছে পরাজিত আমেরিকার নেতৃত্বে পাশ্চাত্যের শক্তি পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার নিমিত্তে এবং সোভিয়েতকে শায়েস্তা করার ইচ্ছায় ফ্যাসিষ্ট হিটলারকে শক্তি সঞ্চয়ে উৎসাহিত করে। পরবর্তীতে এডলফ হিটলার শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করে ক্রান্ত হয়নি, মানব সভ্যতার ইতিহাসকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করে যাহা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নামে পরিচিত।

Schuman পর্যবেক্ষণ করেন যে, 'এ ডলপ হিটলারের সাথে পাশ্চাত্য শক্তিগুলোর ১৯৩৮ সালের মিউনিক চুক্তির কারনে ছয় বৎসর ব্যপ্ত যুদ্ধের শেষের কয়েক মাসের পূর্ব পর্যন্ত হিটলারকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্য শক্তিগুলো যথেষ্ট শক্তি প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকে। তিনি মনে করেন, এই কারনেই পাশ্চাত্য শক্তি চেকোস্লাভাকিয়ার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছিল এবং পূর্ব ইউরোপ ও বালকান অঞ্চলের উপর হিটলারের ক্ষমতাকে বাধাহীন করে দেয়। পাশ্চাত্যের শক্তি সমূহ আশা করেছিল হিটলার তাদের স্বস্তিতে রেখে রাশিয়া আক্রমণ করে তুষ্ট থাকবে। (সূত্রঃ lbid)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংযজ্ঞের ইতিহাস সর্বত্র সহজলভ্য তাই এ বিষয়ে নুতন করে কিছু লিখার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। যুদ্ধের পর একদিকে মানবাধিকার, স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষার বিষয়টি অতীব প্রয়োজনীয় বাস্তবতায় ১৯৫১ সালের জেনেভা কনভেনশন নামীয় আন্তর্জাতিক চুক্তিতে রূপ নেয় এবং অপরদিকে বিশ্বব্যাপী উপনিবেশিক সাম্রাজ্যের সীমানা ছিন্ন করে জাতিসত্ত্বার বিকাশ লাভের নিমিত্তে জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তি আন্দোলন গতিশীল হয়ে উঠে। ফলশ্রুতিতে একের পর এক দেশ রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিয়ে পৃথিবীতে আবির্ভুত হতে থাকে। যুদ্ধের শেষে স্বাধীনতা ও মানবাধিকার রক্ষার্থে গঠিত জেনেভা কনভেনশনের প্রক্রিয়ায় পাশ্চাত্যের দেশগুলো ১৯৮০ দশক পর্যন্ত রিফুজীদের অধিকার রক্ষায় দৃশ্যত: সচেষ্ট ছিল এবং রিপুজীদের অনেকটা উদারভাবে অভ্যর্থনা জানালেও পরবর্তীতে এই ধারাবাহিকতা লোপ পায় এবং আজকের গনতান্ত্রিক আমেরিকার একক নেতৃত্বাধীন পৃথিবীতে রাজনৈতিক আশ্রয়গ্রহণকারীগণ দুস্কৃতিকারীর সমার্থক হয়ে পড়েছে। Estelle d'Halluin, এবিষেয়র উপর পর্যবেক্ষণে বলেন, জেনেভা কনভেনশন ১৯৮০ দশক পর্যন্ত উদারতা নিয়ে প্রয়োগ করা হয়; এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পুনর্নির্মান, স্নায়ুযুদ্ধের যুক্তিকতা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঐ সময়কালে রিফুজীদের অভ্যর্থনা জানাতে সাহায্য করে। পরবর্তীতে পাশ্চাত্যের দেশগুলো অর্থনীতির মন্দাভাব ও সামাজিক অবস্থা খারাপ হওয়ার কারনে আবাসনকারীদের নিয়ন্ত্রণ করতে আরম্ভ করে এবং রিফুজীরা দুস্কৃতিকারীর সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়" (সূত্রঃ Estelle d' Halluin, Between Testimony and Exprtise : How lmmigration Policies Change the Humanutarian Ethic, in Non GOVERNMENTAL POLITICS, edited by; Michel Feher, Gaelle Krikorian and Yates Mekee; Zone Books, 2007, P.419.)।

অপরদিকে আমেকিার নেতৃত্বাধীন পাশ্চাত্যের দেশগুলো যুদ্ধত্তোর পুনর্নির্মান এবং স্নায়ূযুদ্ধে তাদের অবস্থান ও কার্যকলাপকে যুক্তিযুক্ত করার স্বার্থে রিফুজী সংক্রান্ত বিষয় ও মানবাধিকার রক্ষায় উদারতা দেখালে ও নব্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলো বা পাশ্চাত্যের শক্তিশালী দেশ সমূহের তুলনায় অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা দেশগুলোতে আনুষ্ঠানিক উৎসব ব্যতিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকার রক্ষার ধারনাকে প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার নিমিত্তে প্রকৃত অর্থে কোন উদ্যোগ নেয়নি বা সহযোগিতা করেনি।

অন্য যে বিষয়টি এই পরিসরে উলেখ্য সেটা হচ্ছে দ্বী-কেন্দ্রিক বিশ্ব শাসন ব্যবস্থা (Bipolar World Order)। দ্বীতিয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির বিজয়ের পিছনে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি এবং এর ধারাবাহিকতায় যুদ্ধের পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন আমেরিকার পাশাপাশি আরেকটি পরাশক্তি রূপে আবির্ভুত হয়। অর্থনৈতিক নীতিমালায় সোভিয়েত ইউনিয়ন কৃষক-শ্রমিক ও অন্যান্য গরীব মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির বিষয়টিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নে সর্বশক্তি নিয়োগের অঙ্গীকার পুর্নব্যক্ত করে। জার্মানী দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং পুর্ব জার্মানী, পোলান্ড, হাঙ্গেরীসহ পূর্ব ইউরোপের কিছু দেশ সোভিয়েত বকেত অবস্থান নেয়। পৃথিবীর ক্ষমতায় ভারসাম্য দু'ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে তাদের ভাষায় আমেরিকার নেতৃত্বাধীন পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক পরিবারের শক্তিধর পুঁজিবাদী দেশগুলো এবং অপরদিকে সোভিয়েত নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দেশগুলো। দুই পরাশক্তিই বিশ্বব্যাপী প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে কাজ করতে থাকে। দুই পরাশক্তির প্রভাব বিস্তারের এবং প্রতিযোগিতা স্নায়ুযুদ্ধ নামে পরিচিতি লাভ করে। স্নায়ুযুদ্ধ আরম্ভের সময় এবং আদর্শের বাহ্যিক লে বেল নিয়ে রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের মধ্যে মত ভেদ রয়েছে। তাদের কেউ কেউ মনে করেন স্নায়ুযুদ্ধ মূলতঃ বলশেভিক বিপবের পর থেকে আরম্ভ হয়েছিল এবং তাদের অনেকে মনে করেন স্নায়ুযুদ্ধের আবরনের উপর আদর্শগত দ্বন্দ্বের স্টিকার লাগানো থাকলেও মূলত ইহা পরাশক্তির মধ্যকার পৃথিবীকে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবার যুদ্ধ ছিল। স্নায়ুযুদ্ধের উপর ব্যাপক পর্যালোচনা করা আমার এই লিখার বিষয় বস্তুর মধ্যে পড়ে না বিধায় এ বিষয়ে গভীরে যাবার অবকাশ নেই।

স্নায়ুযুদ্ধের পাশাপাশি যুদ্ধত্তোর পৃথিবীতে পুনর্মিান এবং সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে ছোট-বড় সব ক'টি দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে পৃথিবীকে যুদ্ধ বিগ্রহের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা ও সকলের জন্য বাসস্থানের উপযোগী করে তুলার মহান ব্রত নিয়ে জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলসহ অনেক আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য বহু জাতিক সংস্থা, সমিতি, লীগ ইত্যাদি জন্মলাভ করে। এসবের সাথে সমান্তরালভাবে কিছু আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সাক্ষরিত হয়। শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটা সত্য যে, জাতিসংঘ থেকে আরম্ভ করে কোথাও এসব সংস্থা, সংঘ ইত্যাদির গঠন ও পরিচালনা য় গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়নি। আমেরিকার নেতৃত্বে গণতন্ত্রের আলখেলা পরিহিতরা অর্থ, দেশের সংখ্যা ও লোকবলে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী হয়েও কখনও ঐসব আন্তর্জাতিক সংস্থা য় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নিয়োগ ও পরিচালনার কথাটি উচ্ছারন পর্যন্ত করেনি। এসব আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো প্রকৃত পক্ষে বৃহৎ শক্তিধরদের এবং বিশেষ করে ৮০ দশকের পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অনুন্নত গরীব দেশগুলোর প্রতিনিধিদের মাঝে মধ্যে জাতিসংঘ বা এ জাতীয় কোন সংস্থায় বসার সুযোগে নিজেদের চৌহদ্দির জানান দেয়া এবং পরাশক্তির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে খুশিতে আত্মহারা হয়ে থাকাটা ই উন্নয়নশীল বিশ্বের কূটনীতির অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

সাম্প্রতিক কালের ধর্মীয় উগ্রবাদের গোড়াপত্তনঃ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ একদিকে পৃথিবীকে জঘন্যতম ধ্বংসযজ্ঞের ইতিহাস জন্ম দেয় এবং অপরদিকে বিশ্বব্যাপী মানুষের স্বাধিকার ও স্বাধীনতার আন্দোলনকে বেগবান করে তুলে। উপনিবেশিক শাসনে নিপীড়িত জনগোষ্ঠী নিজেদের শক্তির উপর আস্থাভাজন হয়ে উঠে এবং নুতন করে আশার আলো দেখতে পায়। ফলশ্রুতিতে উপনিবেশিক শাসনের শৃংখল ছিন্ন করে একের পর এক জাতি, রাষ্ট্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা

লাভ করে পৃথিভীর মানচিত্রে আবির্ভুত হতে আরম্ভ করে। নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলো দু'দিক থেকে আন্তর্জাতিক শক্তির চাপের মুখে পড়ে। একদিকে পরাশক্তিদ্বয়ের প্রভাব বলয়ে রাখার চেষ্টা এবং অপরদিকে নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বা স্বাধীন হতে যাচ্ছে এমন †দশগুলোর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ নিজেদের কাছে রাখার স্বার্থে পরাশক্তি আমেরিকা এবং ক্ষরিষু উপনিবেশিক সাম্রাজ্যে সমূহে র মধ্যকার দ্বন্দ্বের কষাঘাত। এই পরিসরে নতুন স্বাধীনতা প্রাপ্ত এবং আফ্রিকা, এশিয়া ও ল্যাতিন আমেরিকার দুর্বল আর্ত-সামাজিক কাঠামোর জাতি রাষ্ট্র সমূহে গণতন্ত্রের বিকাশ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সার্বজনীন ভোটাধিকারকে বাধাগ্রস্ত করে ভিন্ন পথে পরিচালিত করতে আমেরিকা জঘন্যতম ভূমিকা পালন করে। পাশ্চাত্যের দেশগুলো থেকে পিছিয়ে থাকা ছোট বড় সবক'টি অনুন্নত দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনে সহযোগিতা করার পরিবর্তে ঐসব দেশে আমেরিকা নেপথ্য শক্তি হিসেবে সামরিক-বেসামরিক স্বৈরাচার, রাজা-শেখদের স্বেচ্ছাচার ও পরিবারতন্ত্র, রাজনীতিকের মুখোশধারী দুর্বৃত্তের শাসন এবং সর্বোপরি ধর্মীয় উগ্রবাদীদের সহযোগিতা দিয়ে রাজনীতিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। শুধু অমেরিকা কেন, ধর্মীয় উগ্রবাদকে উস্কানি দিয়ে বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক অস্হিতিশীল অবস্হা শৃষ্টি করে নিজেদের প্রভাব বিস্তার এবং দখল করে নেয়ার কাজে বৃটিশ যুক্তরাজ্য ও কম যায়নি। সোজা ভাষায় গনতান্ত্রিক লেবাসে আচ্ছাদিত সব কটি বিশ্বশক্তির অন্যদের দেশ দখল বা উপনিবেশ স্হাপনের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে পৃথিবীর সর্বত্র ধর্ম, বর্ন, জাতি, গোষ্টি ও ট্রাইবের মধ্যকার দন্দকে উস্কানি দিয়ে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির ঘটনা গুলো ইতিহাসে উজ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

আমেরিকার নেতৃত্বে উন্নয়নশীল †দশ গুলোতে জনগনের রাজনৈতিক চেতনাকে বিকাশ হতে না দিয়ে, আভ্যন্তরিন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে এবং ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে দাঙ্গা হাঙ্গামা লাগিয়ে দিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্টা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভবনাকে চিরতরে পঙ্গু করে দেয়া হয়েছে। লুন্ঠন অভ্যাহত রাখা এবং একক আধিপত্য স্হায়ী করার ঘৃণ্য উদ্দেশ্যে উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রায় সর্বত্র প্রক্সিযুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, সামরিক ও বেসামরিক একনায়কদের কুশাসন, অত্যাচার, রাজা ও শেখদের স্বেচ্ছাচারিতার সাথে আমেরিকা জড়িয়ে আছে। এমনকি স্বাধীনতা লাভের আগেই আমেরিকার প্রভাব বলয়ে রাখার নিমিত্তে প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ বা জি ও পলিটিকেল দৃষ্টিকোন থেকে গুরুত্বপূর্ণ মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সহ অনেক দেশকে ই প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার নগর রাজ্যের আয়তনে ভেঙ্গে চোরে শক্তিহীন করে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। এতদব্যতিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার রক্ষা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বুলিকে পুঁজি করে উন্নয়নশীল দেশসমূহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবকে নির্বিঘ্নে করার নিমিত্তে চাপ সৃষ্টি, অনাধিকার প্রবেশ, সরকার বদলের পক্ষে যুদ্ধ এবং স্বৈরাচারী দুর্বৃত্তদের লালন করে আমেরিকা পক্ষান্তরে গণতন্ত্রের প্রসারকে বাধাগ্রস্ত করে রেখেছে। বিখ্যাত বেলজিয়ান অধ্যাপক, Jean Bricmont, তার লিখিত 'Humanitarian Imperalism-Using Human Rights to Sell War' বইতে মানবাধিকার ধারনায় অপপ্রয়োগের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। বইটি হচ্ছে মানবাধিকার ধারনাকে অপপ্রয়োগ করে সাম্রাজ্যবাদী কর্মকান্ড পরিচালনা করার কেইচ স্টাডিতে '(Case study) ভরপুর একটি ঐতিহাসিক দলিল। অধ্যাপক Bricmont, এই বইতে Humanitaran intervention এর উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, যে বামরা এইসব ভিত্তিহীন Humanitaran intervention কে সমর্থন করে তাহারা প্রয়োজনীয় ইডিয়ট (সূত্রঃ www.monthlyreview.org/humanitarianimperialism.htm)। আমেরিকা যে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকার রক্ষা মহান তাগিদে মাকড়শার জালের ন্যায় গোটা বিশ্বের উপর আধিপত্য বিস্তার করে বসে আছে, সেকথা বিশেষ বিশেষ কারনে পুরস্কৃত বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল

এবং এ জাতীয় অন্যান্য সংস্থায় চাকুরিরত কতিপয় ভাগ্যবান কর্মকর্তা এবং বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আংকেল সামের পোষ্য কিছুসংখ্যক এজেন্ট ও দুর্বৃত্ত ছাড়া আর কেউ বিশ্বাস করে না ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত্তোর কাল থেকে স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন সময় পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে, একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এই যুক্তিটি, পশ্চিমা বিশ্বের প্রতি সহানুভূতিশীল, প্রধান শ্রুতবাহী গবেষক ও ব্যাখ্যাকারীরা অতিদ্রুত খন্ডন করে দিতেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সাথে সুর মিলিয়ে প্রধান শ্রুতধারায় পর্যবেক্ষকরা যুক্তি দেখাতেন যে, আমেরিকা ধর্মেবিশ্বাসীদের পক্ষের একটি নরম শক্তি এবং নাস্তিক সমাজতান্ত্রিকদের ঠেকাতে মহান দায়িত্ব পালন করে চলছে। স্নায়ুযুদ্ধের পর এই প্রধান শ্রুত ধারার গবেষক বিশেষকরাই আবার মার্কিন সাম্রাজ্যের প্রয়োজনীয়তাকে যুক্তি দিয়ে বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্য করে তুলতে চাইছেন। অরেগান (Oregon) বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক John Bellamy Foster, তার 'Naked Imperialism : America's Persuit of Global Dominance (Newyork : Monthly Review Press 2006) বইতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একটি চমৎকার বিশেষণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, স্নায়ুনযুদ্ধকালীন সময়ে প্রধান শ্রুতধারার বিশেষকরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এই ধারনাটি খুব দ্রুত খন্ডন করে দিতেন। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে বিভিন্ন দেশে জনপ্রিয় সরকারদের উৎখাত করা যেমন, ইরান,গুয়েতেমালা,কঙ্গো এবং ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে পুরাদস্তর যুদ্ধকে তাহারা একইভাবে বিশেষণ করতেন। ১৯৯০ দশক থেকে এবং বিশেষ করে ৯/১১ এর পর থেকে ঐ প্রধান শ্রুতধারার বিশেষকদের ব্যাখ্যা টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে (সুত্র:www.monthlyreview.org/nakedimperalism.htm)।

অন্যদেশের আভ্যন্তরিন বিষয়ে হস্তক্ষেপ, সরকার বদল, যুদ্ধ বিগ্রহ ইত্যাদি চাপিয়ে দিয়ে অন্য দেশের এবং বিশেষ করে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশ সমূহের আর্থ-সামাজিক কাটামোকে ধ্বংস করে ঐ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে স্থায়ীভাবে আমেরিকার প্রতি নির্ভরশীল করে রাখা ই হচ্ছে একক পরাশক্তির জাতীয় স্বার্থ এবং জাতীয় নিরাপত্তার অংশ। পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন ধর্মীয় উগ্রবাদীদের লালন পালন করে রাজনীতিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে গোটা বিশ্বকে এবং বিশেষ করে গণতন্ত্রে বিশ্বাশীদের অস্তিত্বকে আশঙ্কার মধ্যে নিক্ষেপ করে রেখেছে। বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিকূল এবং বিশ্ব শান্তির জন্য বিপদজ্জনক ধর্মান্ধতাকে রাজনীতিতে টেনে এনে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের লক্ষ্য নিয়ে মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে জঙ্গীবাদে রুপান্তরিত করে একহাজার বছরের ও বেশী সময় থেকে গড়ে উঠা সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে হুমকির মূখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপক Samaul Huntington তার Clash of civilization' বইতে বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যকার সংঘর্ষের সম্ভবনা এবং ভয়াবহতাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশেষণ করে দেখিয়েছেন। ধর্মান্ধতা থেকে উদ্বুদ্ধ সন্ত্রাসবাদ আজ আর কোন বিশেষ দেশে সীমাবদ্ধ নয়। যদিও প্রাচ্য এবং প্রাশ্চাত্বের অনেক গবেষক ৯/১১ এ সংঘঠিত ঘটনা সমূহকে ইরাক এবং আফগানিস্তানে আক্রমনকে আমেরিকার জনগনের কাছে গ্রহনযোগ্য করার নিমিত্বে একটি সাজানো নাটক মনে করেন। যেমন বিশিষ্ট গবেষক Webster Griffin Tarpley মনে করেন ৯/১১ ঘটনা স্বয়ং আমেরিকার উচ্চ পর্যায়ের অফিসিয়েলদের ছত্রচ্ছায়ায় আমেরিকার ভিতরের কোন দুর্জন গোষ্টির নেটওয়ার্ক জড়িত এবং এর সাথে যুক্তরাজ্য, কানাডা, ইসরাইল বা অষ্ট্রেলিয়ার গোয়েন্দা বাহিনীর যুগসাজোস রয়েছে (সুত্র:Tarpley, Webster Griffin, 9/11 SYNTHETIC TERRORISM, MADE IN USA, Fourth Edition, Progressive Press, April

2007,p.9> also available at www.Tarpley.net)। তবু ও ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে বিশ্বের একক পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা বেষ্টনি ভেদ করে টু-ইন টাওয়ারে হামলা, কয়েক হাজার মানুষের প্রাণহানি এবং ধ্বংসলীলা প্রমাণ করে যে, সন্ত্রাসীরা আধুনিক মরণাস্ত্রে সজ্জিত এবং পৃথিবীর সর্বত্র আঘাত হানতে সক্ষম। তারপরও দুনিয়াব্যাপী সন্ত্রাসী কর্মকান্ড এবং এর পাশাপাশি সন্ত্রাস দমনের নামে শুধু ভুমন্ডল নয় বরং মহাকা শের প্রতি ইঞ্চি শূন্য স্থান কৌশলগত কারনে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা অব্যাহত ভাবে চলছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তির দাবিতে উপনিবেশিক-সাম্রাজ্যের সর্বত্র আন্দোলন গড়ে উঠে এবং ফলশ্রুতিতে উপনিবেশিক শাসকরা আন্দোলনকে স্থিমিত করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রেখে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়। নব্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বেশকিছু দেশে জাতীয়তাবাদী শক্তি ক্ষমতায় আসলেও অনেক দেশকে আবার স্বাধীনতা প্রদানের প্রাক্কালে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বিভক্ত করা হয়। জাতীয়তাবাদী শক্তির উত্থানে ভয় পেয়ে উপনিবেশিক শাসকরা সর্বত্র নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোতে জাতি, গোষ্ঠী, ট্রাইব ও মানুষের মধ্যকার ধর্মীয় ব্যবধানকে উস্কানি দিয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামায় পর্যবসিত করে দেশকে অস্থিতিশীল করতে তৎপরতা চালাতে থাকে। প্রাকৃতিক সম্পদ ও আঞ্চলিক কৌশলগত গুরুত্ব বিবেচনা করে দ্বীতিয় বিশ্বযুদ্ধের অনেক পূর্ব থেকেই এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অনেক দেশে আমেরিকা ও উপনিবেশিক শাসকবর্গ সকল প্রকারের সহযোগিতা দিয়ে ধর্মীয় উগ্রবাদী, বর্ণবাদী ইত্যাদি দুর্বৃত্তদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বসিয়ে গণতন্ত্রের প্রসারকে স্তব্ধ করে রাখে। বিশ্বশক্তি, পরাশক্তি বা পরবর্তীতে একক পরাশক্তি নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে থেকে ধর্মীয় উগ্রবাদীরা শোষণ ও লুণ্ঠনের অর্থ, নিজেদের দেশের জনগনকে অধিকার বিহীন রেখে ও মানবাধিকারের ধারণাকে অস্বীকার করে বিশ্বব্যাপী জেহাদ সংঘটিত করতে ব্যয় করে চলছে।

গণতন্ত্রের মূল কথা তথা জনগণের সার্বভৌমত্ব ও আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনায় ইসলামের প্রথম যুগের পরামর্শ সভার (সুরা) আদলে, বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে একটি নির্বাচিত পরামর্শ সভা তথা পার্লামেন্টে এবং নির্বাচিত সরকার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সৌদি আরবের অফিসিয়ল ওহাবী ইসলাম ধর্ম বিশ্বব্যাপী এবং বিশেষ করে মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে দীর্ঘদিন থেকে ধর্মীয় উগ্রবাদ লালন করে আসচে। সৌদি আরবে ধর্মীয় উগ্রবাদ কিভাবে প্রতিষ্ঠা পেল, তার উপর একটু নজর দেয়া যাক। বলতে গেলে খোলাফায়ে রাশিদিনের সময় থেকেই কোন কোন সময় ধর্মীয় উগ্রবাদের আবির্ভাব হলেও কখনও উগ্রবাদীরা মূল ধারায় মুসলিমদের আকৃষ্ট করতে পারেনি। উগ্রবাদীদের বিপরীতে ইসলাম ধর্ম তার সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শের প্রতীক সরূপ বিশ্বব্যাপী প্রসার লাভ করে। ইসলামের ইতিহাসের প্রথম যুগের উগ্রবাদীরা খারিজি নামে পরিচিত। তার অনেক দিন পর হাম্বালী মতবাদের চিন্তাবিদ ও শাস্ত্রজ্ঞ শেখ ইবনে তাওমিয়া (জন্ম ১২৬৩) ইসলামে উগ্রবাদী মতবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেও পূর্ববর্তী খারিজিদের ন্যায় তিনিও মূলধারার মুসলমানদের আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হন। পরবর্তীতে মোহাম্মদ-ইবনে আব্দুল ওয়াহাব (জন্ম ১৭০১) নামক চিন্তাবিদ আবার নুতন করে উগ্রবাদী ধ্যান-ধারনাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন এবং মোহাম্মদ -ইবনে-আল সউদকে , নেজদের প্রধান গোত্রের আমির নিয়োগ করেন। পরবর্তীতে আল সউদ নেজদের সব ক'টি গোত্রকে একের পর এক পরাজিত করে নিজে দের করায়ত্ব করেন। এক পর্যায়ে আল-সউদের দ্বিতীয় প্রজন্ম ব্রিটিশ সম্রাজ্যের উস্কানিতে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের সহযোগি শক্তি হিসেবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অটোম্যান সাম্রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। তুর্কি/অটোমান সম্রাজ্যের

বিরুদ্ধে আরবদের বিদ্রুহ মক্কার গ্রেন্ড শারিফ, হুসেইন ইবনে আলীর (১৮৫২-১৯৩১) নেতত্বে বর্তমান সৌদি আরবের হেজাজ থেকে আরম্ভ হয়েছিল।

অটোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আরবদের বিদ্রোহের অর্ন্তনিহিত কারন ছিল আরব ভুখন্ডের স্বাধীনতা।আরব ও বৃটিশদের মধ্যে এ নিয়ে গোপন চুক্তি ও ছিল। যুদ্ধের পর বিজীত বৃটিশরা ঐ গোপন চুক্তিটি বেমালুম ভুলে গিয়ে ফ্রান্স এর সাথে পরাজিত অটোমান সম্রাজ্যের ভুখন্ডকে ভাগ বাটওয়ারা করে নেয়।বিশ্বশক্তিদের ডিগবাজির মোড়ক উম্মোচন করার স্বার্থে একটি ঐতিহাসিক দলিলের উপর দৃষ্টিপাত করতে চাই।১৯১৭ সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের সফলতার পর পূর্ববর্তি জার এবং অর্ন্তবর্তীকালীন প্রশাষণের একটি গোপন দলিল বলশেবিকদের হস্তগত হয়। ঐ দলিলটি ১৯১৬ সালের মে মাসে সাক্ষরিত হয়েছিল।এই চুক্তিটি বৃটিশ এবং ফ্রান্সের প্রধান মধ্যস্হতাকারী স্যার মার্ক সিকেস এবং জর্জেজ পিকটের নামে সিকে স-পিকট চুক্তি নামে পরিচিত।এই গোপন চুক্তি অনুযায়ী বৃটিশ এবং ফ্রান্স আরবদের কোন ভুখন্ডকে স্বাধীনতা না দিয়ে পরাজিত অটোমান সাম্রাজ্যকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল(সুত্র: The Middle East in Bible Prophecy, A publication of the United Church of God, Printed in U.S.A., 2007. P 42)। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই বৃটিশরা ই আবার অন্যদিকে আরব ভূখন্ডকে স্বাধীণতা প্রদানের আশ্বাশ দিয়ে আরবদেরে অটোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ করেছিল এবং আরবদের সাথে গোপনে চুক্তি ও করেছিল।

অপরদিকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ধর্মকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক সুবিধাভোগ করার কাটামোগত প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় । এই প্রক্রিয়াকে অর্থবহ করতে আমেরিকার প্রভাব বলয়ের †দশ গুলোর †কান কোন খেত্রে ভুমিকা থাকলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ই অতিশয় গুরত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে । এ পরিসরে প্রথমেই ইসরাইল রাষ্ট্রের নাম দিয়ে আরম্ভ করতে চাই । রাষ্ট্র হারা কোন জনগোষ্ঠীর জন্য নিজস্ব কোন রাষ্ট্রের ব্যবস্থা করা যেতে ই পারে অথবা বিভিন্ন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে কৌটা ভিত্তিতে রাষ্ট্রহারাদের পুনর্বাসন করা সম্ভব ছিল । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের হত্যাযজ্ঞ থেকে রক্ষা পাওয়া ইহুদিরা বা অন্য যে কোন ধর্মাবলম্বী মানুষকে অন্তত: মিত্র পক্ষের দেশগুলোতে সহজে ই পুনর্বাসন করা যেত । হঠাৎ করে আমেরিকার নেতৃত্বে এবং যুক্তরাজ্য, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য শক্তিশালী দেশের সহযোগিতায় ফিলিস্তিনি ভূখন্ডের শহর, গ্রাম এবং জনপদ ধ্বংস করে ১৯৪৮ সালে শুধুমাত্র ইহুদি ধর্মালম্বীদের জন্য একটি নিজস্ব আবাস ভূমি, ইসরাইল রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন করা হয় । ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আরব অঞ্চলের ধর্মনিরেপেক্ষ রাজনৈতিক আদর্শে উদ্বোদ্ধ ফিলিস্তিনি জনগোষ্ঠীর শান্তিপূর্ণ জীবন ধারার প্রতি আঘাত করা হয় । এর পাশাপাশি আমেরিকার পৃষ্টপোষকতায় ইসরায়েল প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বন্ধুসূলভ সম্পর্ক বজায় রাখার পরিবর্তে অস্ত্রের ভাষায় কথা বলা ও দখল ইত্যাদি অব্যাহত রাখার নীতি অনুসরন করে চলতে থাকে এবং মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার বিশ্বস্ততম: দেশ হিসেবে ইসরায়েলকে দীর্ঘদিন থেকে অলিখিত আনবিক বোমা ধারনকারী শক্তিতে বলীয়ান করে রাখা হয়েছে । ফলশ্রুতিতে গোটা বিশ্বের মুসলিম জনগোষ্ঠীর একটি অংশ ইসরায়েলের আগ্রাসন ঠেকাতে ধর্মীয় আদর্শের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধের শক্তিতে পরিণত হওয়ার চেষ্টা করছে । ইসরায়েল বিরুধী এই প্রতিরোধ শক্তির মধ্যে ধর্মীয় উগ্রবাদ স্বাভাবিক কারনে ই অনেকটা স্থান করে নিতে সক্ষম হয় ।

দ্বীতিয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলার কত্ক ইহুদী নিধন যদিও ইহুদীদের জন্য একটি স্বাধীন আবাস ভূমি প্রতিষ্টার প্রয়োজনকে তরান্বিত করেছিল বলে যুক্তি দেখানো হয় কিন্তু দ্বীতিয় বিশ্বযুদ্ধের অনেক আগে ১৯১৬ সালে তখনকার ক্ষয়িষ্ণু বিশ্বশক্তি, বৃটিশ যুক্তরাজ্য গোপন চুক্তির মাধ্যমে প্রকৃতঅর্থে ইসরাইল রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নে বলশেভিকদের ক্ষমতায় আরোহনের পাঁচ দিন আগে বৃটিশ যুক্তরাজ্য তাদের পরারাষ্টমন্ত্রী আর্থার জেমস্ বালফোরের নামে উ ।

( : Ibid. p.42)।

এই ধারাবাহিকতায় বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি আমেরিকা এবং তার পদাঙ্ক অনুসরনকারী শক্তিশালী দেশগুলো আজ ও জনগনের রাজনৈতিক চেতনাকে অন্যদিকে প্রতিবাহিত করার স্বার্থে ধর্মীয় উগ্রবাদকে উস্কানি দিয়ে আসছে। ফিলিস্তিনি ভূখন্ডের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট এবং পিএলও'র শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যান প্রয়াত ইয়াসির আরাফাতকে রাজনীতির মাঠ থেকে উৎখাতের ষড়যন্ত্রের কথা বিশ্ববাসীর মনে নিশ্চয়ই এখন ও তাজা খবর হয়ে ঝুলে আছে। ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির নেতা, আরাফাতকে সাইজ করতে গিয়ে আমেরিকা ও তার বন্ধুরা পক্ষান্তরে ধর্মীয় উগ্রবাদী হামাসকে ফিলিস্তিনিদের অপ্রতিরোধ্য শক্তি র প্রতিকে রূপান্তরিত করেছে। তেলআবিবে নিযুক্ত আমেরিকার রাষ্ট্রদূত Daniel Kuzner এর একটি বক্তব্যে এই সত্যকে দ্বিধাহীনভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ২০০১ সালের শেষেরদিকে রাষ্টদুত বলেন্ইসরাইলের সমর্থনে ফিলিস্তিনি রাজনীতিতে হামাসের আবির্ভাব হয়েছিল।কেননা, ১৯৮০ দশকের শেষ দিক থেকে ইসরাইল ফিলিস্তিনি জনগনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ধংস্ব করতে ফিলিস্তিনি জনগনকে ধর্মের দিকে ধাবিত করা শ্রেয় ধরে নিয়ে কাজ কাজ করতে থাকে (সূত্র: Daniel Kuzner, Ha'aretz, December 21, 2001, quoted in Webster Tarpley's 9/11 Synthetic Terrorism, Made in USA, Proressive Press, 2004, P.361)।

শুধু ফিলিস্তিন বা ইসরাইল নয় শুধু মুসলিম ও ইহুদি নয়, পৃথিবীর সর্বত্র বিভিন্ন ধর্মের মধ্যকার ব্যবধানকে পুঁজি করে ইশ্বরের নামে খুন-খারাবি করার ন্যায় চরমপন্থী প্রবণতাকে সমর্থন দিয়ে মুলতঃ পৃথিবীকে ক্লা স-অ ব-সিভিলাইজেশনের দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। সমাজতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করার নামে পৃথিবীর যত্রতত্র নিজেদের অপছন্দনীয় জাতীয়তাবাদী, প্রগতিশীল ও ধর্মনিরেপেক্ষ চরিত্রের প্রায় সকল সরকার কে অস্থিতিশীল করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ধর্মীয় উগ্রবাদীদের ব্যবহার করতে কোন সময় ভুল করেনি। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে একটি বিষয় পরিস্কার প্রতীয়মান যে, আরব অঞ্চলের প্রগতিশীল সরকারের বিরুদ্ধে সব সময় ই আমেরিকা ও বৃটিশের পৃষ্টপোষকতায় ধর্মের আবরনে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালানো হয়েছে। এমন কি প্রাশ্চ্যাত্ব বিরুধী ইসলামী জঙ্গীবাদ কখন ই স্বয়ংসিদ্ধ ছিল না। যদি ও আমেরিকার দখলদারী অব্যাহত রাখার কঠ্বর সমর্থক থিংকটেংক্ক, স্যামূয়েল হানটিংটন এবং ব্যারন্যার্ড লুইস (Samuel Hauntington and Bernerd Luis) ইসলামী জঙ্গীবাদকে একটি স্বয়ংসিদ্ধ বিষয় হিসেবে প্রতিষ্টিত করতে ভ্রান্ত চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। Tarpley তার পযবেক্ষনে বলেন যে,১৯৭৮ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের সময়কালে জাতীয় নিরাপত্তার দায়ীত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা Zbigniew Brezezinski ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রতিশোধ নেয়ার নিমিত্তে সোভিয়েত ইউনিয়কে অস্হিতিশীল করতে সোভিয়েত অর্ন্তভুক্ত মধ্য এশিয়ার প্রজাতন্ত্র যথা কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, তাজাকিস্তান, কিরগিজিয়া, তুর্কমেনিস্তান এবং চেচনিয়া সহ ককেসাস অঞ্চলের সর্বত্র ধর্মীয় জঙ্গীবাদ কে উস্কানি দিয়ে প্রতিষ্টিত করেছিল (সূত্র: Tarpley, Webster Griffin, 9/11 Synthetic Terrorism, Made in USA, P.357)।

এটা পরিস্কার যে, ১৯৪৫ সালের পর থেকে আমেরিকা এবং নাটো (North Atlantic Treaty Organization-NATO) ভূক্ত দেশগুলো আরব ও মুসলিম দেশগুলোর সর্বত্র ধর্মনিরেপক্ষ এবং জাতীয়তাবাদী আদর্শে আধুনিকায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্হ করে ধর্মীয় জঙ্গীবাদ প্রতিষ্টিত করতে কাজ করছে।পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মিশর, আফগানিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েসিয়া, বসনিয়া, কসভও এবং আরব অঞ্চলের দেশ সমেত আফ্রিকার সর্বত্র এক ই উদাহরন বিদ্যমান এবং গনতন্ত্র বিরূধী এই অপকর্ম আজ ও অব্যাহত গতিতে চলছে।

বিগত শতাব্দী র দ্বীতিয়ার্ধ †থকে যে দু'জন ইসলামী চিন্তাবিদ বিপবী ইসলামী মতবাদকে রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেন, তারা হলেন ভারতের এবং পরবর্তীতে পাকিস্তা নের †মীলানা

আবুল- আলা-মওদুদী ও মিশরের জনাব সাইদ কুতুব। মাওলানা মওদুদী জামাতে ইসলামী দলের প্রতিষ্ঠা এবং ভারত-পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভের কঠোর বিরুধী ছিলেন। তিনি আধুনিকতাকে বর্বরোচিত হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের কঠোর প্রতিবাদী ছিলেন এমনকি মাওলানা মাওদুদী পাকিস্তান রাষ্ট্রের জনক নামে খ্যাত মোহাম্মদ আলী জিন্নার ভৌগলিক সীমারেখার ভিত্তিতে উত্থাপিত জাতীয়তাবাদকে 'জাহিলি ফানাটিজম' বলে আখ্যায়িত করেন। মৌলানা মওদুদীর ভাষায় জাতীয়তাবাদ জাহিলি-বর্বতাকে সমাজে প্রতিষ্টিত করার পাশাপাশি মানব জাতির জন্য দুর্ভাগ্য নিয়ে আসতে বাধ্য (সুত্রঃ Sivan,Emmanuel,Radical Islam,Yale University Press, Newyork and London, 1985, P.39)। অনেক সমাজ জিজ্ঞানী মনে করেন, মাওলানা মওদু দীর ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতার বিরোধিতা বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভারত ও পাকিস্তানকে স্বাধীনতা প্রদান প্রলম্বিত করতে সাহায্য করে এবং পুরস্কারস্বরূপ মাওলানা মওদুদি বৃটিশ সাম্রাজ্যের কাছ থেকে সুবিধা নিয়েছেন।

মাওলানা মওদুদীর পাশাপাশি সাম্প্রতিক কালের আরেক ইসলামী বিপববাদী চিন্তাবিদের নাম হচ্ছে 'সাইয়েদ কুতুব'। তিনি বৃটিশ-মিশরে ১৯০৬ সালে জন্মগ্রহন করেন। তিনি একাধারে একজন আমলা, আধুনিক শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক এবং আমেরিকায় যাবার পূর্ব পর্যন্ত জামাল আব্দুন নাসেরের আরব জাতীয়তাবাদের একজন সমর্থক ছিলেন। ১৯৬০ দশকের প্রথম দিকে তিনি উচ্ছ শিক্ষার্থে বৃত্তি নিয়ে আমেরিকায় যান, আমেরিকা থেকে ফিরে এসে তিনি ইসলামী বিপববাদের উপর লিখা আরম্ভ করেন এবং মিশরের ইখওয়ান-তথা মুসলিম ব্রাদারহুডের একজন বিপ্লবী নেতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। সাইয়েদ কুতুবের ইসলামী বিপববাদী মতবাদের বিকাশের পিছনে আমেরিকার প্রভাব ছিল এমনটি অনেকেই ধারনা করেন। ব্যাপারটি এমন ভাবা যুক্তিহীন যে, একজন খ্যাতনামা আমলা, একজন আধুনিক সাহিত্যিক ও সাহিত্যসমালোচক আমেরিকায় যাবার আগ পর্যন্ত আমেরিকার সমাজ ব্যবস্হা এবং সংস্কৃতি সমন্ধে কিছু ই জানতেন না। তার মতবাদের অনুসারীগন বলে থাকেন যে, সাইয়েদ কুতুব আমেরিকায় সাংস্কৃতিক অবক্ষয় তথা নারী পুরুষের অবাধ মিলন দেখার পর নিজ দেশ মিশরে ফিরে ইসলামী বিপ্লবে আত্বনিয়োগ করেন। আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ঐ সময়টাতে মার্কিন প্রশাষন মিশরের নাসের সরকারকে উ খাত করার কাজে আদাজল খেয়ে লেগেছিল। অতএব নাসেরের ধর্মনিরপেক্ষ আরব জাতীয়তাবাদকে পদদলিত করার স্বার্থে আমেরিকা সাইয়েদ কুতুবকে দিয়ে সাম্প্রতিক কালের ইসলামী বিপ্লববাদের গোড়াপত্তন করেছিল বলাটা কোন ভাবে ই অযৌক্তিক নয়। মৌলানা মাওদুদীর ন্যায় সাইয়েদ কুতুব ও সকল প্রকারের জাতীয়তাবাদ, অন্ধদেশপ্রেম এবং এতদসংক্রান্ত সকল সুত্র-থিওরিকে জীবনিশক্তি হীন ও বর্বতার প্রতিক বলে আখ্যায়িত করেন (সুত্র: Sayid Qutub, Milestones, P.8)।

তারপর আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের হস্তক্ষেপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রশাষণের প্রত্বেক্ষ্য সাহায্যে সারা বিশ্বের মুসলিম সম্প্রদায়কে ভূমিকম্পের ন্যায় ঝাকুনি দিয়ে জাগিয়ে তুলে। আমেরিকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় এবং মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলোর আর্থিক সহযোগিতায় বিশ্বের সব এলাকা থেকে মুসলিম প্রতিরোধ যুদ্ধারা আফগানিস্তানে এসে জড়ো হয়। এইসব প্রতিরোধ যুদ্ধাদের পাশাপাশি আবার মুসলিম ও অমুসলিম সব ধরনের প্রায় দুইশত ষাটটিরও বেশি চ্যারিটি সংগঠন আফগানিস্তানে কাজ করতে আসে। Jerome Bellon-Jourdan এর মতে বিখ্যাত চ্যারিটিজ যথা the Salvation Army, Catholic Relief Services, এমনকি Save the children এবং Midecins Sans Frontieres সহ আফগানিস্তানে কর্মরত সকল চ্যারিটি সংগঠন মানবিক কারনে সাহায্য করার নিরপেক্ষ ভূমিকা বিসর্জন দিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শত্রুর বিরুদ্ধে কাজ করে। ১৯৮৬ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন কে শায়েস্তা করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে।'এই আফগান মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের জেহাদি সৈন্য বলে দেখত, (সূত্রঃ Jerome Bellion-Jourdan, are Muslim

Charities Purely-Humanitarian?A Real but Misleading Question, in NON COVERNMENTAL POLTICS, Zoon Books, Newyork, 2007, p.650)। আফগানিস্তানের মুক্তিযুদ্ধাদের সাহায্যের নামে মূলত আমেরিকা মৌলানা মওদুদী এবং সাইয়েদ কুতুবের ইসলামী জঙ্গীবাদকে বিশ্বব্যাপি প্রতিষ্টিত করে দেয়। এটা কোন গোপন বিষয় নয় যে, দক্ষিণ এশিয়ার তালেবান জঙ্গীরা আমেরিকা এবং পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্হা এন এস আই এর দ্বারা শৃষ্ট এবং তালেবান জঙ্গীরা ২০০১ সাল পর্যন্ত আমেরিকার সকল প্রকার পৃষ্টপোষকতা পেয়েছে।

৯/১১ ব্যাপক প্রাণহানির পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন কিছুসংখ্যক উগ্রবাদী ধর্মীয় সংগঠনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ওদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যা দেয় এবং ওদের বিরুদ্ধে লোক দেখানো যুদ্ধ ঘোষণা করলেও মুল ধর্মীয় উগ্রবাদীদের উপর সর্বাত্মক আঘাত হানা থেকে বিরত রয়েছে। ৯/১১ এর ঘটনাকে পুঁজি করে আমেরিকা বিশ্বব্যাপি সন্ত্রাসি আক্রমন অব্যাহত রাখার লাইসেন্স নব্ব্যায়ন করে নিয়ে আফগানিস্তান ও ইরাক আক্রমন করল। ৯/১১ ঘটনার তা পর্যবেক্ষনের পর বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ Arno Mayer বলেন, ১৯৪৭ সাল থেকে গনতন্ত্র ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্টার নামে আমেরিকা কুমতলব চরিতার্থ করার উদ্দেশে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ অব্যাহত রেখেছে এবং সর্বত্র প্রথম আঘাত আমেরিকা ই করে থাকে , (সুত্র: Historian, Arno Mayer's immediate observation of post 9/11, quoted in Noam Chomsky's, Super Power and Failed States, Khalej Times, April 5, 2006)।

বিশ্বের গরিব জনগোষ্ঠীর বা বিভিন্ন দেশের জনগণের সমস্যা সমূহকে রাজনৈতিকভাবে সমাধান করার পরিবর্তে আমেরিকা এখনও পৃথিবীর দেশে দেশে ধর্মীয় উগ্রবাদীদের পৃষ্টপোষকতা দিয়ে চলছে। একদিকে আমেরিকা ইসরাইলের দখলদারী র পক্ষে শক্ত অবস্তান নিয়ে আছে এবং অন্যদিকে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ সমূহে মওদুদীবাদী, জামাতে ইসলামীর বিপবীদের মডারেট আখ্যা দিয়ে তুষন নীতি অব্যাহত রেখেছে। মধ্যপ্রাচ্যের তেল সমৃদ্ধ দেশগুলোর টাকায় বিশ্বব্যাপী মৌলবাদ লালনের প্রক্রিয়া কে উ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র প্রসারের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে চলছে। কেবলমাত্র গণতন্ত্রকে আশ্বস্হ ক‡র পপুলার (Popular democracy) গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উন্নয়নশীল অঞ্চলসহ বিশ্বের সর্বত্র জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। আর একাজটি কৃষক, শ্রমিক, পেশাজীবী ও শ্রমজীবিদের রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বোদ্ধ করে তথা সমাজের বৃহত্তর অংশের মানুষদেরে রাজনীতি সচেতন করে তুলে গনতন্ত্র প্রতিষ্টার মাধ্যমেই কেবল সম্ভব।

অরাজনৈতিককরন নয় বরং সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে রাজনৈতিক দীক্ষায় দীক্ষিত করে এবং বিশেষ করে সমাজের অবহেলিত গরীব জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে উদ্বুদ্ধ করে একটি রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত ক রার কোন বিকল্প আজ আর অবশিষ্ট নেই। একটি ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে ই কেবল সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন, ধর্মীয় †মৌলবাদ, ঘুষ-দুর্নীতি, গণবিমূখ আমলা তান্ত্রিক দৌরাত্ব এবং দুবৃত্ত রাজনীতিকদের লুটপাট চিরতরে মুলোৎপাটন করা সম্ভব। উন্নয়নশীল বিশ্বের অনেক দেশ গরীব জনগনকে সাথে নিয়ে নিজ নিজ দেশের সম্পদ রক্ষাকল্পে প্রকৃত গনতন্ত্র প্রতিষ্টার সংগ্রাম অব্যাহত ভাবে চালিয়ে আসছে।

উন্নয়নরশীল বিশ্বের দেশগুলোর জনগণ এবং বিশেষত রাজনৈতিক নেতা, কর্মী ও সরকারি কর্মকর্তা - কর্মচারী বন্ধুদের একটি কথা স্মরনে রাখা খুব ই প্রয়োজন যে, কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা বা কোন বিশেষ দেশ উন্নয়নের সোনার হরিণ কোন উন্নয়নশীল দেশে নিয়ে এসে জবাই করে ভাগ বন্টন করে খাইয়ে দিলেই কোন উন্নয়ন সাধিত হবে না। উন্নয়নের হরিণ ধরতে হলে নিজেদের চেষ্টা করতে হবে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর গন বিচ্ছিন্ন আমলা, মধ্যস্বত্বভোগী রাজনীতিক এবং টেংক-গণতন্ত্রিরা জনগণের অবহেলিত অংশ তথা কৃষক ও শ্রমিকের রাজ নীতিতে অংশগ্রহন এবং †ট্রই ড ইউনিয়ন কর্মকান্ডকে বিদেশী বিনিয়োগের জন্য ক্ষতিকর হিসেবে তুলে ধরে এই মানুষগুলোকে রাজনীতি থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিতে দিতে দৃশ্যত: ক্ষান্ত হয়ে পড়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এটা একটি কৌশলগত হঠকারী কাজ। তোষামূদকারী সরকার গুলো উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্বত্র দালাল লেলিয়ে দিয়ে সমাজের এই অবহেলিত মানুষদের রাজনীতি এবং ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ড থেকে দূরে রাখতে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে। একদল বহুরূপি রাজনীতিক এবং ঠেংক গণতন্ত্রীরাই তাদের বিদেশী মুনিবদের ফরমায়েশ রক্ষা করতে গিয়ে গরীব মানুষদেরকে গণতান্ত্রিক ধারায় আন্দোলন সংগ্রামে অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাজনৈতিক শক্তিতে বিকশিত হওয়ার পথকে বন্ধ করে রেখেছে। দেশী বা বিদেশী সব ধরণের বিনিয়োগ যে, উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য একথাটি বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে এর পাশাপাশি আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা উচিত। আর সে বিষয়টি হচ্ছে আজকের এই উন্নত প্রযুক্তির সময়ে প্রযুক্তির ট্রান্সফার বিনিয়োগের মধ্যে না থাকলে কোথাও কোন উন্নয়ন সাধিত হওয়া সম্ভব নয়। উন্নয়নশীল বিশ্বে কোথাও বিনিয়োগের অংশ হিসেবে প্রযুক্তি ট্রান্সফার করার উদাহরণ অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্যের বিগ ব্রাদারগণ উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর লোলপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বসে আছেন। তাহারা অধিক মুনাফা লাভের নেশায় †কবল মাত্র প্রাকৃতিক সম্পদ তথা গ্যাস, তেল, কয়লা, সোনা, রুপা, হিরা ইত্যাদি খাতে কেবল বিনিয়োগে আগ্রহী। উন্নয়নশীল দেশগুলো র সার্বিক উন্নয়নে তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। নিজেদের প্রাকৃতিক সম্পদ অন্যদের হাতে তোলে দিয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়নের আশা করা শুধু †বাকামী ই নয় বরং এটা †দশ ও জাতির সাথে প্রতারণা ও বটে।

## বর্তমান বিশ্ব পরিস্হিতিতে কি **করতে হবেঃ**

উন্নয়নশীল দেশগুলোর শাসন-শোষণের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সর্বত্র একটি কাঠামোগত সমতা লক্ষ্য করা যায়। আর সে সমতা হলো গণতন্ত্র বিরোধী শাসন পদ্ধতিকে গণতন্ত্রের নামে পরিবেশন। শাসক গোষ্ঠীর আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারনে এবং লুটপাট অব্যাহত রাখার স্বার্থে সব দেশে ই মাঝে মধ্যে ক্ষমতার হাত বদল হয়ে থাকে এবং প্রতিটি হাত বদলের পর সরকারের নুতন সবকটি মুখ নিজেদেরকে দেবতা তূল্য সৎলোক হিসেবে তুলে ধরতে চেষ্টা করেন। দিন অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে এরা স্বৈরাচারী রূপে আবির্ভূত হয় এবং জনগণের ভোট প্রয়োগের ক্ষমতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি হুমকি হয়ে দাড়ায়। এসব দুর্বৃত্তরা, ব্যক্তিগত ভাগ্য গড়ে তুলা ও †দশের প্রাকৃতিক সম্পদকে বিদেশী আংকেল সামদের হাতে তুলে দেয়া ই তাদের প্রধান দায়ীত্ব মনে করে।

দু'একটি দেশ ব্যতীত উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্বত্র গণতন্ত্রকে হাতকড়া লাগিয়ে শক্তির জোরে শাসন কার্য পরিচালনা করা এবং এই বর্বরোচিত কার্যধারাকে যুক্তিযুক্ত করার প্রয়াস বিদ্যমান। লক্ষনীয় যে, সাম্রাজ্যবাদ বিস্তৃতির প্রক্রিয়ায় একবিংশ শতাব্দীর একক পরাশক্তি উন্নয়নশীল বিশ্বের এসব লুটেরা শাসকগোষ্ঠীকে অনুমোদন দিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে বন্ধ করে রেখেছে। উন্নয়নশীল বিশ্বের জনগণকে গনতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মানবাধিকারের গোটা ধারনা কে ই আজ সমাধীস্থ করে রাখা হয়েছে। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করতে হলে প্রথমে ই আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক স্বংস্হা ও বৃহ ।।

উন্নয়নশীল বিশ্বের অবস্থান পর্যালোচনা করলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, একটি আলৌকিক শক্তি এ পৃথিবীর সর্বত্র এই ষড়যন্ত্র পরিচালনা করে চলছে। এই আলৌকিক শক্তি‡ক চিহ্নিত করার কাজটি আজ

আর গবেষকদের নথিপত্রের মধ্য সীমাব দ্ধ থাকেনি। দিবালোকের মত এই সত্যটি আজ পরিষ্কার হয়ে পড়েছে যে, একক পরাশক্তি গোটা বিশ্ব দখলে রাখার স্বার্থে গনতন্ত্র বিরুধী প্রক্রিয়ার সাথে সর্বতোভাবে জড়িত। নিউলিবারেল বিশ্বায়ন পদ্ধতি ও গণতন্ত্র বিরোধী কাঠামোর দ্বারা পরিচালিত। এই বিষয়টি আজ উন্নয়নশীল বিশ্বের জনগণকে বুঝতে হবে যে, প্রতিটি দেশে জনগণের নাগরিক অধিকার হরণের কাজটি এককভাবে শুধু দেশের সীমা রেখার ভিতরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লুটেরা শাসক গোষ্ঠী করতে পারে না। তাদের একটি পিতৃ সংস্থা (Father Organisation) এবং এর পিছনে একটি বৃহ শক্তি থাকা প্রয়োজন। এই বিশ্বায়নের দানবীয় চাপ আজ শুধু কথা র কথা নয়। জনগণের জীবন-জীবিকার সংগ্রামকে ধ্বংস করার স্বার্থে মানুষের মধ্যকার সম্পর্ককে ব্যবসায়ী ভিত্তিতে পুনঃস্থাপন করেছে। স্থানীয় লুটেরা শাসক গোষ্ঠী এবং তাদের পিতৃ সংস্থা তথা বিশ্বায়ন একত্রে মিলে জনগণের নাগরিক অধিকার কেড়ে নিয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদ চুরি করছে, একের পর এক মিল কারখানা ধ্বংস করে চলেছে, কৃষি, শিল্প, শিক্ষাসহ সবক'টি খাতকে সাধারণ জনগণের নাগালের বাহিরে নিয়ে ধ্বংস করার পাঁয়তারা করছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর ছিন্নভিন্ন আর্থ সামাজিক অবস্থার উপর কোন প্রকারের প্রসাধনিক প্রলেপ এটে দিয়ে সংস্কারের অবকাশ আজ আর অবশিষ্ট নেই। কোন স্বঘোষিত সৎ লোকের বা এই উদ্দেশ্যে সাজানো কোন সংস্থার সদিচ্ছার উপর উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন নির্ভর করে না। ব্যর্থ রাষ্ট্রের দ্বারপ্রান্তে দন্ডায়মান উন্নয়নশীল দেশগুলোর আর্থসামজিক কাঠামোর ধ্বংসাবশেষকে থেরাপি দ্বারা পুর্নজীবিত করার চিন্তা করা শুধু বোকামি নয় আরেকটি হঠকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এই ধ ংস্বাবশেষ থেকে উঠে আসা র জন্য একটি সর্বাত্মক আন্দোলনের প্রয়োজন। মূল জায়গা হাত না দিয়ে শুধু শুধু উপর থেকে সংস্কা রের নামে কিছু চা পিয়ে দিলে বা দু'একটি স্থানে কিছু পরিবর্তন সাধন করে কোন সুদুর প্রসারী ফল পাওয়া যাবে না। এগুলো সময়ের ও টাকার অপচয় এবং পুরাতন দুর্গন্ধময় অবস্থাকে টিকিয়ে রাখার আরেকটি অপকৌশল মাত্র।

প্রকৃত পরিবর্তন কামনা করলে প্রথমেই সংস্কারের আরম্ভের স্থর অর্থাৎ বেসমেন্ট নির্ধারণ করতে হবে। অর্থাৎ কোথেকে সংস্কার চালাতে হবে। কোন দেশ ছোট হোক বা বড় সর্বত্রই ভিত্তি হচ্ছে জনগণ। তাই জনগণের গভীর থেকে সংস্কারের আরম্ভ করতে হবে। তারপর ঠিক করতে হবে আন্দোলনের লক্ষ্য মাত্রা। বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে শুধু দেশীয় শাসকগোষ্ঠী নয় এর পাশাপাশি পরাশক্তির নেতৃত্বে পরিচালিত দানবীয় বিশ্বায়ন উন্নয়নশীল দেশের গরীব জনগোষ্ঠীর জীবনকে দুর্বিসহ করে রেখেছে। তাই আজকের এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেকটি উন্নয়নশীল দেশে সংস্কার সাধন করার লক্ষ্য হবে দুটো, এক-নিজ নিজ দেশে দুর্নিতি ও দৌরাত্বের মুলোৎপাটন করে প্র কৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, দুই- অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি বিশেষের মুনাফা লুটার ইচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বিশ্বায়নকে আঘাতে আঘাতে ধংস করে দিয়ে বিশ্বের সকল মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারে প্রতি সহানুভূতিশীল একটি বিকল্প গণতন্ত্রিক বিশ্বায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এই দুটি লক্ষ্য সাধনের আন্দোলন এক সাথেই করতে হবে। একদিকে বাদ দিয়ে অপরটির উপর শুধু জোর আরোপ করলে সকল প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য। কেননা বিশ্ব বাজারের ধারণার পরিবর্তে বিশ্ব নাগরিক অধিকারের ধারনাকে বিকল্প বিশ্বায়নের ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করাতে ব্যর্থ হলে উন্নত বা অনুন্নত সকল দেশে গণতন্ত্র গতিহীন হয়ে পড়বে। অনাকাংখিত টাকার ছড়াছড়ি এবং গণতন্ত্রের নামে ধাপ্পাবাজি আজ আর শুধু উন্নয়নশীল দেশের লুটেরা শাসক শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং তথাকথিত গণতান্ত্রিক পরিবারের সদস্যভূক্ত দেশগুলোতে মাঝে মধ্যে প্রকাশ পায়। বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাসীন মানুষ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বুশ (জুনিয়র) তিনির প্রথম মেয়াদে জনগণের ভোটের রায়ের পরিবর্তে কোর্টের রায়ে আল গোরকে হারিয়ে নির্বাচিত হওয়ার ঘটনা নিশ্চয়ই এখনও আমাদের স্মৃতিপঠে

বিদ্যমান আছে। এতদ্বব্যতীত বেশ কয়েক বিলিয়ন ডলার ছাড়া কেউ এসব নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার চিন্তাই করতে পারে না। গণতন্ত্রের ভবিষ্যত খোদ আমেরিকা সহ গনতান্ত্রিক পরিবারের অনেক দেশেই আজ আর নিরাপদ নয়।

পৃথিবীর সবকটি দেশের সমষ্টি হচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং ভূগর্ভের স্থলভাগকে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়ে দেশগুলোর অস্তিত্ব বিরাজমান। প্রতিটি দেশের জনগণই হচ্ছে নিজ নিজ দেশের প্রকৃত মালিক। রাজা-বাদশাহ, শেখ, কিং, কুইন ইত্যাদিরা পাহারাদার বা পরকাষ্টা মাত্র। এ বিশ্বকে মানুষের বসবাসের উপযোগী করে তুলার দায়িত্ব অবশ্যই জনগণের উপর বর্তায়। শুধু গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে নয়, আমেরিকার নেতৃত্বে পরিচালিত বিশ্বায়নের হিংস্র থাবা থেকে আজ গণতন্ত্র ও বিশ্বমন্ডলকে নিরাপদ রাখতে হবে। গণতন্ত্রকে আশ্বস্থ করা অর্থাৎ উন্নত বিশ্বে গণতন্ত্রের ক্রম বিকাশ এবং অনুন্নত বিশ্বে (উন্নয়নশীল বিশ্বে) গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে আন্দোলনের বেজমেন্ট ধরে গোটা বিশ্বের শান্তি প্রিয় জনগোষ্ঠীর সর্বাত্মক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার বিকল্প আজ আর অবশিষ্ট নেই। এই আন্দোলনের লক্ষ্য হচ্ছে উন্নয়নশীল বিশ্বের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও স্থানীয় লুটেরা শাসক শ্রেণীর লুটপাট ও চৌর্যবৃত্তি বন্ধ করা এবং এর পাশাপাশি বর্তমান মানুষখেকো বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে জবরদস্তিমূলক উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোর উপর চাপিয়ে দিয়ে আমেরিকা যে লুণ্ঠন ও চৌর্যবৃত্তি চালিয়ে যাচ্ছে, সেটা আঘাতে আঘাতে চুর্ণবিচুর্ণ করা এবং এ সবুজ বিশ্ব মন্ডলকে পণ্যদব্যে রূপান্তরিত হওয়ার বিপদ থেকে রক্ষা করা।

**গণতন্ত্র একটি আদর্শ :**

সকল স্তরের জনগণের নাগরিক অধিকার ফিরিয়ে দেয়া এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কে ভিত্তি ধরে নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারলে ই কেবল গনতন্ত্র প্রতিষ্টা সম্ভব হতে পারে। সর্বপ্রথম গণতন্ত্র হচ্ছে একটি আদর্শ এবং একটি আদর্শ হিসেবে গনতন্ত্র সমাজ গঠনের প্রজেক্ট সরূপ কাজ করে এবং সমাজে একটি নৈ তিক মূল্যবোধের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে। গণতন্ত্র মানুষ সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক প্রয়োজনে এবং মানুষের আন্দোলনের মাধ্যমেই কেবল প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত হতে পারে। নৈতিক মূল্যবোধ এবং নীতিমালা হচ্ছে গণতন্ত্রের সার কথা এবং আজকের পৃথিবীতে রাষ্ট্র পরিচালনায় সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য একটি আদর্শ। এই আদর্শ আবার শাষনকার্য পরিচালনায় একটি শক্তি তে পরিনত হয় এবং একটি শক্তি হিসেবে অর্থনীতি ও রাষ্ট্র ক্ষমতা পরিচালনায় সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষের অধিকারকে বিবেচনার মধ্যে রাখে।

অ পরদিকে আবার আমাদের এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে গনতন্ত্রের ছায়াতলে বিকশিত সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার সাথে অসাদৃশ্য কোন এক বিশেষ মডেলের গণতন্ত্রকে ভিত্তি হিসেবে ধরে নেয়া হবে বাস্তবতা বিবর্জিত কাজ। এদিক থেকে আজকের এই বহুকেন্দ্রীক পৃথিবীতে দেশ ও সমাজের মধ্যকার প্রভেদকে ভিত্তি বিবেচনা করে অধিকাংশ জনগণের মতামতের প্রতিফলন ঘটানোর মাধ্যমেই কেবল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আমেরিকা বা অন্য কোন দেশ কর্তৃক গণতন্ত্র পাচার বা রপ্তানি করার কোন যৌক্তিকতা কোন গবেষণার মধ্যে খোঁজে পাওয়া যায়নি। এখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অবকাঠামোর একটি অংশ তথা ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদের বিষয়টি পরিস্কার করা উচিত। আমরা কেহই ব্যক্তিতা অস্বীকার করতে পারি না। আমাদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবোধ আছে। তবে বর্তমান বিশ্বায়নের মুল নীতি, তথা নিউলিবারেলিজম এবং এর উদ্যোক্তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঢালাও করে যেভাবে ব্যক্তিতাবাদকে মানুষের মধ্যকার সম্পর্কের প্রধান আদর্শ (Value) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। নিউলিবারেলিজম ব্যক্তি স্বার্থতাকে সমষ্টির স্বার্থের উপর স্থান দেয় এবং গোটা ভূমন্ডলের

সবকিছুকে পণ্যদ্রব্য হিসেবে বিবেচনা করে। নিউলিবারেলিজমের এই নিয়ন্ত্রণহীন ব্যক্তি স্বার্থতা নাগরিক ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী। কেননা নাগরিক ধারনা সমষ্টিগতভাবে জনসাধারণের মানবিক মূল্যবোধ এবং অধিকারকে ব্যক্তিতাবাদ বা ব্যক্তি স্বার্থের উপরে স্থান দেয়। স্বাধীনতা, সমতা এবং অসাদৃশ্যতা হচ্ছে নাগরিক মূল্যবোধের প্রধান বিষয়বস্তু এবং যে কোন উন্নয়নশীল দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দো ল‡ন এই নাগরিক মূল্যবোধ কে গুরোত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে।

যে কোন উন্নয়নশীল দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের নিয়ামক শক্তি হচ্ছে অসুবিধাজনক অবস্থা নে নিক্ষেপিত কৃষক, শ্রমিকসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সমন্বয়ে গঠিত জনগণের বৃহত্তম অংশ। গণতন্ত্রকে সঠিক অর্থে আশ্বস্থ করতে হলে জনগণের এই অবহেলিত বৃহত্তম অংশকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলা অপরিহার্য। এটা হচ্ছে সকল জনগনের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট একটি রাজনৈতিক কাজ। আর এই কাজটি রাজনৈতিক ভাবে ই করতে হবে। হটা স

। পৃথিবীর বহুদেশে গনতন্ত্র প্রতিষ্টার ইতিহা সে এর সত্যতা বিদ্যমান। গণতান্ত্রিক বিপবসহ পৃথিবীর যে কোন সামাজিক পরিবর্তন রাজনৈতিক দলের †নতৃ ত্ব ছাড়া হয়নি।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোল কে সফল করতে হলে জনগনের অবহেলিত অংশ তথা কৃষক-শ্রমিককে আন্দোলনের প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করতে হবে। এই সম্পৃক্ত করনের কাজকে এগিয়ে নিতে রাজনৈতিক নেতা, কর্মী এবং সুশীল সমাজের (Civil Society) কর্মীরা যৌথভাবে টিম গঠন করে শিক্ষকের ভূমিকা পালন ক রা একান্ত প্রয়োজন। টিমগুলো পাড়া-মহলা, গ্রামে-গঞ্জে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে হবে। প্রত্যেকটি টিমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির যে কোন একটি ক্রিটিকেল বিষয়ে জ্ঞানলব্ধ সদস্যদের সমন্বয় থাকতে হবে। টিমের প্রত্যেক সদস্য অন্তত একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে পারদর্শী হতে হবে এবং প্রত্যেক সদস্য নিজের উপর অর্পিত বিষয়কে স্পষ্ট করে অবহেলিত জনগণের অংশের কাছে তুলে ধরে তাদেরকে আন্দোলনে সম্পৃক্ত করতে হবে।

অধ্যাপক Sir Martin Rees এর ভাষায় মা নব জাতি আজ পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে সংকটময় অবস্থানে দন্ডায়মান।অধ্যাপক Rees বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষনের পর বলেন সন্ত্রাস, অনিয়ম ও পরিবেশ দুষন গুটা মানব জাতির অস্তিত্বের প্রতি হুমকি হয়ে দাড়িয়েছে। গবেষনার ফলাফলের ভিত্বিতে তিনি এক সতর্ক বানীতে, একবিংশ শতাব্দীর মধ্যে মানব জাতির অস্তিত্ব ধংস হয়ে যাবার পঞ্চাশ ভাগ সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। (এ বিষয়ে বিশদ জানার জন্য দেখুন: Professor, Sir Martin Rees, Our Final Hour: A Scientist's Warning: How Terror, Error and Environmental Disaster Threaten Humankinds Future in this Century On Earth and Beyond, Basic books, 2004)। এই সতর্কীকর ন বাণীকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়ীত্ব আপনার আমার সকলের। আমাদের দেশ এবং আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীকে রক্ষা ও বাসের উপযোগি করে রাখার দায়ীত্ব আমাদের ই। মানুষ দ্বারা সৃষ্ট পৃথিবীতে বিরাজমান এই ভয়াবহ সংকট থেকে মুক্তি, সকল প্রকার সন্ত্রাস ও অনিয়মের মুলো একমাত্র প্রকৃত গণতন্ত্র (Popular Democracy) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সম্ভব। আর গনতন্ত্র প্রতিষ্টার সংগ্রামে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোর জনগনের বৃহত্তম অংশ কৃষক এবং শ্রমিকদের রাজনীতি থেকে দূরে রেখে সম্ভব হবে না। এ ই

সত্যটি জনগণের সামনে তুলে ধরা এই মুহূর্তে রাজনৈতিক দল, সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষ এবং সুশীল সমাজের আশু কর্তব্য ।

## গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানঃ

গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে তার আশুলক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে প্রয়োজন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান । গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না । গনতান্ত্রিক নিয়ম কানুন এবং প্রতিষ্ঠান সমূহ গণতান্ত্রিক বিতর্ক ও বিবাদকে নিয়ন্ত্রণ করে । এই প্রতিষ্ঠান সমূহ সংবিধান, আইন, উন্নয়ন কর্মকান্ডে জনগনের সম্পৃক্ততা এবং বিভিন্ন পেশার মানুষের মধ্যকার সমযোতা চুক্তির মাধ্যমে বিধিবদ্ধ করে থাকে । গণতান্ত্রিক পরিবেশে বিধিবদ্ধ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান জনগণের বিভিন্ন অংশের জীবন-জীবিকার স্বার্থে উথাপিত দাবী দাওয়া ও বিতর্কের যথার্থতা যাচাই ক রে থাকে । গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রতিটি দেশ ও সমাজে নিশ্চিতভাবে বিভিন্ন শক্তির মধ্যে যুগসূত্র রক্ষা করে । কার্যকরী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রত্যেকটি দেশ ও সমাজের সমষ্টিগত স্বার্থকে ব্যক্তি স্বার্থের উপরে স্থান দেয় । যেসব দেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সমূহ বিকশিত, সেসব দেশে সামরিক আইন, জরুরি অবস্থা, রাজনীতি নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি কালো কানুন প্রয়োগের কোন প্রয়োজন হয় না । কেননা, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সমূহ নিজেরাই শক্তিশালী অবকাঠামো হিসেবে কাজ করে এবং মতের ভিন্নতাকে গণতান্ত্রিক খেলা র অংশ ধরে নিয়ে গণতান্ত্রিক আদর্শের বিকাশ লাভের আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে । রাজনীতি হচ্ছে নিজেই একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠা ন এবং সুষ্ঠু রাজনৈতিক চর্চার মধ্যে দিয়েই কেবল সব ধরনের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের বিকাশ লাভ সম্ভব ।

গণতান্ত্রিক অবস্থান প্রাপ্তির সময়ে সরকারের পৃষ্টপোষকতা, সংশিষ্ট পেশাজীবী সহ জনগনের প্রত্যেক্ষ অংশগ্রহণ এবং সুশীল সমাজের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজে প্রবৃত্ত হওয়া খুবই প্রয়োজন । গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার প্রথম শর্ত হচ্ছে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা করা । গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা লাভ করলে ই একমাত্র সরকার, সুশীল সমাজ, বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ এবং রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিভাজ্য বিষয়ে বিতর্ক সংঘটিত হতে পারে । মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভাল সামরিক শাসন বা নরম জরুরি অবস্থা বলতে কিছুর অস্তিত্ব নাই । গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে রাষ্ট্র পরিচালনা য় †দশের সকল স্তরের মানুষের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানো এবং মানবাধিকার রক্ষা করা অপরিহার্য । এই কথা গুলো উন্নয়নুশীল দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে শুধু পৌছে দিলে ই দায়ীত্ব শেষ হবে না। এর পাশাপাশি এই বিষয়গুলো জনগনের উপলব্ধি তে ধরে রাখার জন্য অনুশীলনের ব্যবস্হা থাকতে হবে । উন্নয়নশীল বিশ্বের দরিদ্র জনগোষ্টির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে একজন সমাজবিজ্ঞাণী বলেছে ন, রাজনীতিতে আপনার স্বার্থ না থাকলেও আপনার প্রতি রাজনীতির স্বার্থ আছে । (সূত্রঃ -Independant Green Voice/available at: www.independentgreenvoice.org) । অর্থাৎ রাজনীতি তে অনীহা থাকায় কোন অবকাশ নাই । কৃষক শ্রমিক সহ সাধারণ মানু ষের রাজনীতিতে অনীহার সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক দস্যুরা জনসাধারণের সম্পদ চুরি করে নিজেদের ভাগ্য গড়ে এবং অন্য দেশে পাচার করে থাকে । তাই, এই মধ্যস্বত্তভোগি রাজনীতিকদের চৌর্যবৃত্তি বন্ধ এবং দেশের সম্পদ রক্ষার স্বার্থে গরীব মানুষদের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহন শুধু দেশ বাঁচানোর জন্য নয় নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে ও অপিরহার্য।

### গণতন্ত্রে নীতিমালা :

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নিয়ে এই পরিসরে লিখার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না । এ বিষয়টি স্কুল কলেজে সর্বত্রই পড়ানো হয়ে থাকে । দেখা উচিত আজকের সাম্প্রতিক পৃথিবীতে গণতন্ত্রকে কিভাবে দেখা দেখা হয় এবং কিভাবে দেখা প্রয়োজন । গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে অন্যদেশের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া এবং

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে জনগণের রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেয়া বা অন্য দেশের পোস্ট-মর্টেম করা ইত্যাদি কালো প্রথা বিশ্বব্যাপি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে আজ ধ্বংস করে চলছে। তাই এসব জলন্ত বিষয়াদির উপর একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করা প্রয়োজন। বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Alistair Mc Connachie গণতন্ত্রে পাঁচটি নীতিমালা চিহ্নিত করেছেন:-

১) বাক স্বাধীনতা এবং বিতর্ক :

আজকের এই নিউলিবারেলিজমের নীতিধারায় লুণ্ঠনের সহযোগী বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় বিশ্বের একক পরাশক্তি লুণ্ঠন অব্যাহত রাখার স্বার্থে পৃথিবীর দেশে দেশে এক নায়ক, স্বৈরাচারী, স্বেচ্ছাচারী, দুস্যবিত্ত এবং ধর্মীয় উগ্রবাদীদের স্বচ্ছ শাসক বা মডারেট খেতাব দিয়ে বিশ্বব্যাপী অপকর্ম অব্যাহত রেখেছে। অপরদিকে, এসব এক নায়ক ও স্বৈরাচারী শাসক এবং ধর্মীয় উগ্রবাদীরা নিজেদের অনাচার-অত্যাচার অব্যাহত রাখার স্বার্থে কখন ও কখনও গনতান্ত্রিক বিধিবিধানের অপ প্রয়োগ করে থাকে। রাজনৈতিক দস্যুরা সময় সময় তথা কথিত ভোটের নামে নিজেদের ক্ষমতা র চাকু ও বল্লমকে সান দিয়ে বার বার জনগণের গলা কাটতে অভ্যস্হ হয়ে পড়েছে। আজকের বিশ্ব পরিস্থিতিতে সকল শ্রেণী পেশার মানুষের এবং বিশেষ করে সমাজের অবহেলিত জনগোষ্ঠীর বাক-স্বাধীনতা র নিশ্চি য়তা প্রদান করে †দশের সকল স্তরের মানুষের দাবী দাওয়ার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি দেশে বিরাজমান সমস্যার সমাধানকল্পে খোলা মেলা বিতর্ক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে সরকার পরিচালনায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি র অনুসরণ করা আশু কর্তব্য বলে তিনি মনে করেন।

২) প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা (Popular democrocy):

প্রকৃত (পপুলার) গণতন্ত্র সর্বতোভাবে (People as a whole) জনগণকে সরকা রে প্রতিষ্ঠিত করে। এই ব্যবস্থা য় জনগণ স্থায়ীভাবে শাসন কার্য পরিচালনা করার নিমিত্তে বিধিসম্মত উপায়ে ক্ষমতার অনুশীলন প্রভাবমুক্তভাবে করতে পারে। পপুলার গণতন্ত্রে জনগণ দেশের পক্ষে নীতিমালা ও আইন প্রণয়নে শুধুমাত্র নির্লিপ্ত প্রজাকুল না হয়ে এই সব সম্পর্শকাতর বিষয়ে নেতৃত্বদানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে।

৩) খোলামেলা, দায়িত্বশীল ও অসাদৃশ্য গণমাধ্যম:

উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হিসেবে আরেকটি বিষয় হচ্ছে খোলামেলা গণমাধ্যম। দায়িত্বশীল এবং অসাদৃশ্য জাতীয় গণমাধ্যম জনগণের জ্ঞানকে বৈধতা এবং মতের অমিলের ক্ষেত্রে আপোষ নিস্পত্তি করতে পারে।

৪) জনগণের জন্য অর্থনৈতিক গণতন্ত্র:

অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের অর্থ হচ্ছে জনগনের অর্থনেতিক ক্ষমতাকে গণ তন্ত্রায়ন করা। আবার এই অর্থনৈতিক গণতান্ত্রয়নের পূর্ব শর্ত হচ্ছে অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ এবং দেশের যে কোন একক ব্যক্তি বা একক ক্ষুদ্র কম্যুনিটি অথবা সমষ্টিগতভাবে জনগণকে অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রদান। অর্থনৈতিক গণতন্ত্র জনগণকে তাদের জীবিকানির্বাহের ক্ষেত্রে অর্থ যোগানের উৎস এবং সরবরাহের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে। এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে হলে, Economic Sovereignty; Sovereignty, February, 2003 দেখুন।

৫) আইনের সমতা বিধান (Equality, before the law/সকল জনগণ আইনের চোখে সমান):

'আইনের চোখে সবাই সমান' উন্নয়নশীল বিশ্বে এটি একটি ডাহা মিথ্যা উক্তি। সরকারি পদবীর প্রভা ব খাটিয়ে, ঘোষগ্রহণে বা চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারী, আমলা, রাজনৈতিক দস্যু এবং সমাজদ্রোহীরা অহরহ নিজেদের স্বার্থে এই মিথ্যা উক্তিটির অপপ্রয়োগ করে থাকে। ষাট থেকে আশি শতাংশ মানুষ যেখানে দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে। অনাহারে অর্ধাহারে মরে যাওয়া যাদের নিয়তি। যেখানে বিশ্বয়ানের প্রক্রিয়ার, বিদেশী প্রভুর লুণ্ঠনকে বেগবান করার স্বার্থে কৃষক, শ্রমিক এবং অন্যান্য

গরীব মানুষদের তাদের পেশা থেকে উচ্ছেদ করা হয় । সেখানে অন্নহীন, বিবস্ত্র কংকালসার মানুষগুলো কি করে কোর্ট নামক ভয়ানক স্থানটির চেয়ার-টেবিলের ফাঁকে ফাঁকে ঘোষ দিয়ে এবং কৌসুলী মহোদয়ের ফিস প্রদান করে ন্যায় বিচার পাবার আশা করে সেটা অভিজ্ঞতার পরিপক্ষ কোন মানুষের পক্ষেই বুঝে উঠা সম্ভব নয় । তাছাড়া পুলিশি হয়রানি এবং স্থানীয় প্রশাসনিক দুর্বৃত্তদের মারপেচ বাংলাদেশ সহ উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্বত্র কর্কট-রুগের ন্যায় বিরাজমান । আইনের চোখে সকল জনগণ সমান এই মহান ধারনাকে যথার্থ করতে হলে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা খুবই প্রয়োজন । এগুলোর মধ্যে প্রথমে ই আসে বিচার পদ্ধতির সংস্কার সাধন এবং সালিশি মধ্যস্থতার (arbitrary manner) উপর নির্ভর না করে লিখিত আইনের উপর ভিত্তি করে রায় প্রদান করা । দ্বিতীয়ত রাষ্ট্র কর্তৃক নি খরচায় পর্যাপ্ত লিগ্যাল এইডের ব্যবস্থা করা এবং এই লিগ্যাল এইড প্রদানকে চ্যারিটি হিসেবে বিবেচনা না করে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রের দায়িত্বের মধ্যে নিয়ে আসা । গণমাধ্যম সর্বস্ব, দুর্নীতি দমন ও গণতা ন্ত্রয়নের প্রক্রিয়াকে কেবল মাত্র দেশের রাজধানীতে সীমিত না রেখে প্রশাষনের নি ম্ন কাঠামো পর্যন্ত গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অনুশীলন করা । কর্তাব্যক্তিদের মনে রাখা খুবই প্রয়োজন যে, একমাত্র গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্হা প্রতিষ্টার মাধ্যমে জনগনকে সার্বভৌম করা সম্ভব হতে পারে (সূত্রঃ www.sovereignty.org.uk/march 2003)।

## সার্বভৌমত্ব ঃ

প্রথমে দেখা দরকার, দেশের সার্বভৌমত্ব বলতে কি বুঝা নো হয়ে থাকে। যে কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব শুধু ভৌগলিক সীমা রেখার নিরাপত্তা বিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ কি-না? এ বিষয়টি পরিস্কার করা প্রয়োজন। করি রাষ্ট্রের সার্বভৌম ত্ব বলতে কেবল মাত্র ভৌগলিক সীমা রেখার নিরাপত্তা বিধানের বিষয়টি অনুন্নত বিশ্বের জনগণের কাছে ইচ্ছাকৃত এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে তুলে ধ রে বিদ্যা প্রকাশ করেন। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি ভ্রান্ত ধারনা। তাই সঙ্গত কারনে এই পরিসরে সার্বভৌমত্বের নীতিমালার উপর আলোকপাত করা প্রয়োজন:-

### ১) রাজনৈতিক স্বায়ত্বশাসণ (Politcal self determination):

সার্বভৌমত্বের প্রথম নীতি হলো জনগণের স্বায় ত্ব শাসন । এর অর্থ হলো জনগণ বিদেশের নরম বা গরম সকল ধরনের হস্তক্ষেপ ছাড়া নিজেরা নিজেদের শাসন করার সক্ষমতা অর্জন । সময় সময় প্রয়োজনে জনগণ নিজেদের জন্য আইন প্রণয়ন ও প্রনিত আইন কার্যকরী ক রার ক্ষমতা অর্জন । মান্ধাতার আমলের তথা উপনিবেশিক শাসকদের বা স্থানীয় দুর্বৃত্তদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন আইন যাহা আজকের দিনে প্রয়োজনহীন বা জনগণের চাহিদার বিরুদ্ধে অবস্থান কওে, আইনের নামে এসব কালোকানুনকে প্রত্যাখ্যান করা র ক্ষমতা অর্জন ।

### ২) অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব (Economic Sovereignty):

জনগণের চাহিদা র প্রতিদৃষ্টি রেখে এবং জনগণের দ্বারা পরিচালিত প্রক্রিয়ায় †দশ ও সকল স্তরের জনগনের প্রয়োজন মেটানোর নিমিত্তে অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার সক্ষমতা ই হচ্ছে অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব ।

### ৩) ব র্ডার নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা অর্জন (Border control):

যে কোন সংগঠন, রাষ্ট্র বা জনগোষ্ঠী যাহারা দেশের অর্থনৈতিক বা ভৌগলিক সীমা রেখা উভয়টি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম নয় তাহা দেরে সার্বভৌম হিসেবে বিবেচনা করা অবাস্তব । অর্থাৎ শুধু ভৌগলিক সীমা রেখা নয়, অর্থনৈতিক সীমা রেখার উপর ও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থা কাটা অতীব প্রয়োজন । এই নীতির আলোকে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল বিশ্বের কোন দেশ ই সার্বভৌম নয় । নিজেদের প্রাকৃতিক সম্পদ বিদেশীদের

নিয়ন্ত্রনে রেখে, বিদেশীদের হাতে তুলে দেয়ার পায়তারার সাথে সম্পর্কিত থাকলে এবং দেশের বাজার ব্যবস্হা সহ আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বিদেশীদের বা স্থানীয় দুর্বৃত্তদের নিয়ন্ত্রণে থাকলে কোন দেশের স্বাধীন ও সার্বভৌম দাবী করা অর্থহীন।

## ৪) স্থানীয়করণ (Localization):

ছলে বা কলে এবং অস জনগণের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বিদেশী প্রভুদের ইচ্ছার কাছে জিম্মি রেখে কোন সরকারের সার্বভৌমত্বের ভড়ং দেখানো জনগনের সাথে উপহাসের নামান্তর। পরাশক্তিদের মুনাফা বৃদ্ধির প্রয়োজনে বর্তমান বিশ্বায়নের হিংস্র হাতিয়ার বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল অনেক আগেই উন্নয়নশীল বিশ্বের জনগণের কাছ থেকে স্বায়ত্ব শাসন ও সার্বভৌমত্বের ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, বিশ্বব্যাংক বা অন্য কোন সংস্থার এক তরফা ব্যবস্থা পত্র উন্নয়নশীল দেশগুলোয় উপর চাপিয়ে দেয়ার প্রচলিত রীতিকে সমূলে প্রত্যাখ্যান করে উন্নয়নশীল দেশ সমূহের স্বার্থের পরিপন্থী সকল প্রকল্প বন্ধ করে দেয়ার ক্ষমতা অর্জনের মাধ্য উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোর স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্ত নির্ভরশীল। ঐ সব আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে উন্নয়নশীল দেশগুলোর চুক্তির ভিত্তি হতে হবে জনগণের চাহিদা, জনগণের প্রয়োজন, দেশের উন্নয়ন এবং সর্বোপরি গণতান্ত্রিক উন্নয়নে সাহায্য করার বাসনা। আর এ সব শর্ত ই কেবল হতে হবে আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের সাথে উন্নয়নশীল দেশগুলোর চুক্তির বিষয়বস্ত্র। এই কাজটি করতে না পারলে কোন দিন ই উন্নয়নশীল বিশ্বে কোথাও গ ণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এই কাজটি সুচারুরূপে সমাধা করতে হলে অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে রাজনৈতিক শিক্ষায়-শিক্ষিত করে তাদেরকে নিজেদের গণতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রয়োগে সক্ষম করে তোলা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই।

## ৫) খাদ্য ও পানির পর্যাপ্ত সরবরাহঃ

ধনী-দরিদ্র, ছোট অথবা বড় যে কোন দেশের জনগণের নিরাপত্তার বিষয়টি আজ আর শুধু দেশের ভৌগলিক সীমা রেখা নিরাপদ রাখার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বর্তমান বিশ্বে জনগণের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য (Food security) ও পানির নিশ্চয়তা বিধান করা স কল †দশের সব সরকারের প্রধানতম করণীয় বিষয়। যদি ও জনগনের খাদ্য ও পানির নিরাপত্তা বিধান করা সুশাসণের প্রধানতম বিষয় কিন্তু এর সাথে বর্তমান জটিল বিশ্বের সর্বত্র জ ন গণের নিরাপত্তার সাথে আরও অনেক বিষয় জড়িত। তন্মধ্যে যেমন পরিবেশ নির্মুল রাখা, জনগণের বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষার বিষয় নিশ্চিত করা এবং সর্বোপরি মানবাধিকার রক্ষা করা করা প্রত্যেকটি সরকারের জন্য অবশ্য করণীয়।

## ৬) শক্তি / বিদ্যুৎ (Energy) গ্রহণের স্বাধীনতাঃ

উন্নয়নের স্বার্থে সকল সার্বভৌম দেশ কে জনগনের চাহিদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের যোগান দিতে সক্ষম হতে হবে। যে সরকা র জনগণের চাহিদা অনুযায়ী শ ক্তির যোগান দানে ব্যর্থ বর্তমান বিশ্ব পরিস্হিতিতে †সই সরকারের ক্ষমতায় থাকা র কোনরুপ বৈধতা অবশিষ্ট থাকেনা। তাছাড়া অবৈধ সরকারের খুটির জূরে বা জবরদস্তি মূলক ভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখা দশের সার্বভৌম ত্বের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য। গনতান্ত্রিক আন্দোল নের মাধ্যমে এরূপ অবৈধ ও অনভিজ্ঞ সরকারের পতন ঘটানো জনগণের নিরাপত্তা এবং দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার পবিত্র দায়ি ত্বের মধ্যে বর্তায়। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ তথা তেল, গ্যাস ও কয়লা ইত্যাদি বিদেশীদের কর্তত্বে না দিয়ে জনগণের পক্ষে বহনীয়-সহনীয় এবং জাতীয় আত্মপ্রত্যয়ের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিদ্যুৎ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা প্রতিটি গনতান্ত্রিক সরকারের জন্য অপরিহার্য।

## ৭) অপশাসন এবং ক্ষমতায় অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ গহণ:

এটি একটি স্পর্শকাতর বিষয়। দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্বত্র অস্বচ্ছ চরিত্রের সরকারগুলো আইন- শৃংখলা এবং দেশের অখন্ডতা রক্ষার নামে জনগণের উপর অত্যাচার নির্যাতন চা লিয়ে দেশের সম্পদ লুটেপুটে খায়। এসব স্বেচ্ছাচারী সরকারগুলো জনগ নকে প্রতিপক্ষ ধরে নিয়ে জনগনের জীবন-জীবিকার সা‡থ সম্পর্কিত দাবী দাওয়াকে শক্তি প্রয়োগ করে স্তব্ধ করে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। এই চরিত্রের সরকার সর্বত্র নিজেদের লুণ্ঠন অব্যাহত রাখার স্বার্থে প্রকৃতপক্ষে নিজের দেশের জনগনের কাছে দায়বদ্ধ না থেকে কোন না কোন বিদেশী শক্তির তাবেদার হয়ে কাজ করতে স্বস্হি বোধ করে। সাম্প্রতিক বিশ্ব পরিস্হিতিতে এসব দায়ীত্বহীন সরকারগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিচালিত নিউলিবারেলিজমের বিশ্বায়ন পদ্ধতি কে প্রতিষ্টিত করার কাজে নিয়োজিত বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এবং এ জাতীয় অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে নিজেদের দেশের সার্বভৌমত্বকে বন্ধক রেখে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষা করতে সদা সচেষ্ট থাকে। তাহারা ঐ সব সংস্থা র জুনিয়ন পার্টনার হিসেবে নিজেদের চৌর্যবৃত্তির পাশাপাশি নিউ-লিবারেলিজমের বিশ্বায়ন পিচাশদের লুণ্ঠন প্রক্রিয়া য় সর্বত্র সহায়তা দিয়ে চলছে।

উন্নয়নশীল বিশ্বের জনগোষ্ঠীর জন্য নিজেদের †দশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ব্যতীত বিদেশী আগ্রাসন এবং আভ্যন্তরিন ষড়যন্ত্র †থকে পরিত্রাণ পাবার আর কোন পথ অবশিষ্ট নেই। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই কেবল নিজ নিজ দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শাসক চক্র এবং আন্তর্জাতিক লুটেরাদের চিরতরে উৎখাত করা সম্ভব। (স্বর্বভৌমত্ব সম্পর্কে আর ও বিশদ জানতে হলে Sovereignty, February 2003 সংখ্যা দেখুন, available at: www.soverieignty.org)।

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক লুটেরাদের উৎখাত করার স্বার্থে বিশ্বের সকল গণতন্ত্রী এক হোন এবং একজন বিশ্ব নাগরিক হিসেবে একটি গনতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্হা প্রতিষ্টা করতে বিশ্বের আনাচে কানাচে সর্ব্ত্র জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলুন।

সমাপ্ত
মোহাম্মদ নেছার আহমদ কায়সার
তারিখ: ৩১/১২/২০০৭